সেকালের চিত্র

শ্রীকালীকৃষ্ণ ঘোষ
প্রণীত

মূল্য ॥০ আনা

১৩২৫ বঙ্গাব্দ

বিজ্ঞাপন।

আমাদের বাল্যকালে ও যৌবনকালে দেশের অবস্থা যেরূপ ছিল, তখন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সব রীতি নীতি এবং নানা প্রকারের কুপ্রথা ও সুপ্রথা প্রচলিত ছিল, সেই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া কোন গল্প করিলে দেখা যায় একালের যুবক ও বালকেরা বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহা শুনিতে চায় এবং শুনিয়া আহ্লাদিত হয়, তাই পূর্ব্বস্মৃতি ও স্মারক লিপি হইতে সংগ্রহ করিয়া এই কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশ করিলাম এবং তাহা "সেকালের চিত্র" নামে অভিহিত করিলাম। ইহার কোন কোন অংশ 'প্রীতি' নামক মাসিক পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া কোন কোন বন্ধু ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, এখন সেই সকল প্রবন্ধ বহুল পরিমানে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করা গেল। ইহা সাধারণে সমাদৃত হইলে সুখী হইব। কোথাও কোন ভ্রম ত্রুটি লক্ষিত হইলে সহৃদয় পাঠক তাহা প্রকাশ করিবেন, যথা সম্ভব সংশোধনের চেষ্টা করিব। ইতি।

শ্রীকালীকৃষ্ণ ঘোষ।

৺ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী ৺ ঈশানচন্দ্র রায়
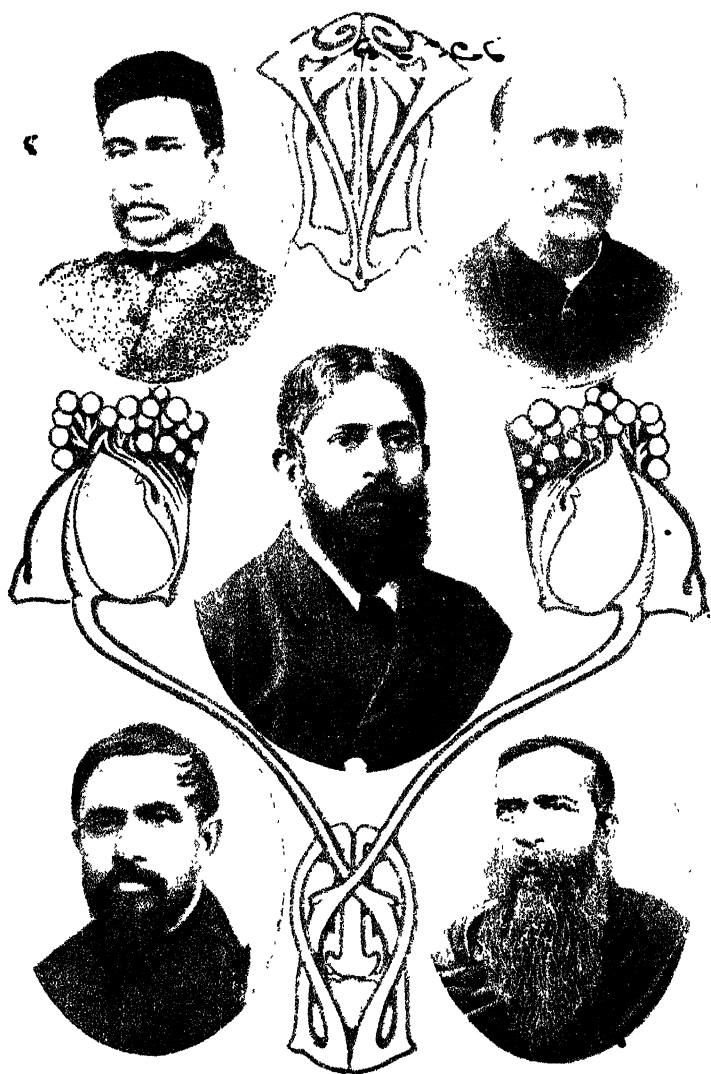
৺ আনন্দমোহন বসু

সেকালের চিত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ—ছাত্রজীবন।

দাশরথি রায় তাঁহার পাঁচালীতে লিখিয়াছেন,—

"পাঠশালাতে লিখেন খড়ি, সরকারে মারে ছড়ি,
ছয় মাসেতে বিদ্যা হয়েছে গণেন উনিশ কুড়ি।"

এটা সেকালের পাঠশালার প্রকৃত চিত্রই বটে। আমাদের ক্ষুদ্র পল্লীটীতে কোন পাঠশালা ছিল না। পল্লীর অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান, হিন্দুদিগের মধ্যেও ভদ্রলোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, সুতরাং ছাত্র জুটিত না বলিয়াই বোধ হয় কোন গুরুমহাশয় আমাদের গ্রামে পাঠশালা খুলিতে চেষ্টা করেন নাই। আমার এক দাদা ছিলেন, তিনি দুই মাইল দূরে এক গণ্ডগ্রামে যাইয়া একজন গোয়ালার বাড়ীতে কতকগুলি ছোকরাকে লেখাপড়া শিখাইতেন। একদিন তিনি তাঁহার বাড়ীতে বসিয়া অপর এক পাঠশালার গুরুম'শায়ের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন; তখন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। শুনিলাম সেই গুরুম'শায় আমার দাদাকে বলিতেছেন, "তুমি যে পাঠশালা কর, ছোকরাদিগকে খুব শাসন কর কিনা? আমি কি করি শুনবে? আমার কাছে যখন কেহ তাহার ছেলেকে ভর্ত্তি করাইতে আনে, আমি তখনই তাহাকে বলি, 'ভাই, এই যে ছেলে আমার কাছে দিতে আনিয়াছ, ইহার কেবল হাড় ক'খানি তোমার, চামড়া ও মাংস আমার। এই সর্ত্তে যদি ছেলেকে এখানে দিতে হয় দাও, না হয় তোমার ছেলে তুমি নিয়া যাও,"—অর্থাৎ শিক্ষক মহাশয় তাঁহার ছাত্রের শরীরে বেত্রাঘাত করিতে করিতে যদি মাংস সহ চর্ম্ম

উৎপাটন করিয়া ফেলেন, তাহাতেও কেহ কোন আপত্তি বা অনুযোগ করিতে পারিবে না। আমি তখন নিতান্ত শিশু; এ সকল কথা শুনিয়া আমার কোমল প্রাণ যেন কাঁপিয়া উঠিল, শরীর শিহরিয়া উঠিল; তখনই সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম; মনে মনে ভাবিলাম, আমাদের যে পাঠশালা নাই, গুরুম'শায় নাই, সেটা ভালই হইয়াছে। তেমন ডাকাতের কাছে শিখিতে গেলে তো একদিনও বাঁচিব না! লোকের মুখে গল্প শুনিতাম যে, সহরে স্কুল আছে, সেখানে ছাত্রদিগকে লোহার বেত দিয়া মারে। তখন মনে মনে সঙ্কল্প করিতাম যে, চিরদিন মূর্খ হইয়া থাকি, তাও স্বীকার, তবু কোন দিন স্কুলে বা পাঠশালায় যাইব না। বাড়ীতে পিতৃদেব এবং পিতৃব্যঠাকুরের কাছে বসিয়া যে কলার পাতে লিখি ও "জাংরী" কাগজে * মক্স করি উহাই যথেষ্ট; তাহাতেই বিদ্যা যতদূর হইবার হইবে। বড় সৌভাগ্যের বিষয় যে, এখন দেশ হইতে ঐ সকল গুরুম'শায়ের নৃশংস অত্যাচার উঠিয়া গিয়াছে। সেই সব পাঠশালার পরিবর্ত্তে এখন গ্রামে গ্রামে সভ্যতানুমোদিত বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহাতে সুশিক্ষিত শিক্ষকগণ সস্নেহে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করিতেছেন। কিন্তু এই সুশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগের মধ্যে যে বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, সেটা আবার এক নূতন রোগ হইয়াছে। এ ব্যাধিটা সে কালে ছিল না।

আমরা মধ্যবিত্ত তালুকদার বা ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী শ্রেণীর লোক; দেশে আমরা নিতান্ত দরিদ্র বলিয়া পরিচিত ছিলাম না। আমরা যখন মহকুমার স্কুলে পড়িতাম, তখন আমাদের জলখাবার বন্দোবস্ত ছিল,—

* সে কালে এমন মসৃণ ও পরিষ্কার কাগজ পাওয়া যাইত না,—এক প্রকার হলদে রঙ্গের খস্‌খসে মোটা কাগজ সাধারণ লেখার জন্য ব্যবহার হইত, তাহার নাম ছিল "জাংরী" কাগজ।

বিকালে স্কুল হইতে আসিবার পর দুমুঠা চিড়া, আর এক টুকৃড়া গুড়। প্রাতঃকালে কিছুই পাইতাম না। বাড়ী হইতে প্রেরিত একবারের চিড়া গুড় ফুরাইয়া গেলে, আবার তাহা আসিতে যে ২।৪ দিন বিলম্ব হইত, সে কয় দিন কুল, পেয়ারা, শশা প্রভৃতি যে কালের যে ফল তাহা দ্বারাই ফলাহার করিয়া কাটাইয়া দিতাম। আম কাঁঠালের দিনে যাহাদের বাসায় সে সব ফলের গাছ থাকিত, তাহাদের তো কোন চিন্তাই থাকিত না। আমাদের বাসায় কয়েকটা কাঁঠাল গাছ ছিল, তাহাদিগকে মাতৃস্থানীয় বলিয়া আজও স্মরণ এবং সম্মান করিতে ইচ্ছা হয়।

একদিন স্কুল হইতে বাসায় যাইয়া দেখি, গাছে একটীও কাঁঠাল নাই, সব ফুরাইয়া গিয়াছে; ঘরের চিড়া গুড় কয়েকদিন পূর্ব্বেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। ক্ষুধা নিবারণের অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া, রান্নাঘরে গিয়া এক মুষ্টি চাউল এক বাটী জলে ভিজিতে দিলাম, ইচ্ছা ছিল যে, চাউলগুলি জলে ভিজিয়া নরম হইলে নুণ দিয়া তাহাই খাইব, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহাও ঘটিয়া উঠিল না। অভিভাবকস্থানীয় এক ব্যক্তি ইতিমধ্যে রান্না ঘরে গিয়া বাটীতে চাউল ভিজা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিলেন, "কেরে? এই ওলাউঠার ঘট স্থাপন করিয়াছে কে?" অর্থাৎ এই কাঁচা চাউলগুলি চিবাইয়া খাইলে তাহাতে উদরাময় ঘটিয়া ওলাউঠা রোগ উপস্থিত হইয়া নিশ্চয়ই অনর্থ জন্মাইবে। এই মন্তব্য শুনিয়া আমার পেটের ক্ষুধা আমাকে ছাড়িয়া বহুদূরে চলিয়া গেল। আমি ভয়ে আর রান্নাঘরের দিকে ফিরিয়াও চাহিলাম না, ও বেলাটা বিনা জলযোগেই কাটাইয়া দিলাম। এই ঘটনাটী আজ পর্য্যন্ত আমার স্মৃতিপটে বিশেষ-রূপে অঙ্কিত রহিয়াছে। পরে যখন সহরে যাইয়া জেলা স্কুলে পড়িতে-ছিলাম, তখন যদিও মাসে ৫৲ পাঁচ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতাম, তথাপি জলখাবার বন্দোবস্ত ছিল, সেই চিড়া আর গুড়। বেগুনবাড়ীর চিড়া,

আর আকের গুড়, খাইতে কিন্তু লাগিত বেশ। মাঝে মাঝে সহুরে ছেলেদের মত কিছু luxury (জাঁক জমক) করিতে ইচ্ছা হইলে দুই পয়সার কচুরী ও এক পয়সার জিলিপী কিনিয়া খাইতাম। এই তো ছিল আমাদের luxury! আজ কালের বাবুরা হয়ত ইহা শুনিয়া হাসিবেন! উইলসনের হোটেল হইতে প্রেরিত লবণাক্ত মাখনলিপ্ত মোলায়েম-রুটীর সহিত চা পান করিয়া যে সকল ছেলে প্রাতঃকৃত্য (breakfast) করিয়া থাকে, এবং আলুর দম ও লুচি বা রকমারি মিঠাই মণ্ডা দ্বারা যাহাদের অপরাহ্ণের জলপান বা tiffin নিষ্পন্ন হয়, তাহারা আমাদের এই সকল দুর্ভাগ্যের কথা শুনিয়া হাসিবে বৈ কি!

সে কালের ছাত্রদেব বসন ভূষণের ব্যবস্থা ছিল অতি সাদাসিদে। বৎসরে চারিখানা ধুতি ও দুইখানা চাদরের বেশী প্রায় কেহই পাইত না। জামা এক সঙ্গে দুইটা অনেকেরই থাকিত না; অনেক বালক একটী জামা দিয়াই সম্বৎসর কাটাইয়া দিত। জামাটী ময়লা হইলে ধোপার কাছে যে কয়দিন থাকিত, সেই কয় দিন শুধু চাদর গায় দিয়াই স্কুল করিয়াছি, এবং অন্যত্র যাতায়াত করিয়াছি। জুতা পূজার সময় একযোড়া করিয়া মিলিত,—তা'ও দিল্লীর নাগরা, অথবা তালতলার চটি! পরে লেভেল বার্ণিশ এবং ছেপাট নামক বিলাতী জুতাও মাঝে মাঝে পরিয়াছি বটে। সেই এক যোড়ায় যতদিন হয় চলিত, পূজা ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত আর দ্বিতীয় জুতা মিলিত না। আমাদের জুতা প্রায় এক বছরই টিকিত, কারণ বৃষ্টি বাদলায় আমরা জুতা পায় দিয়া ঘরের বাহিরে যাইতাম না। আমরা মনে করিতাম, পা জলে ভিজিলেও কোন ক্ষতি হইবে না, কিন্তু জুতা যোড়াটী ভিজিলে উহা একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে; সুতরাং তাহা যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতাম। আজকাল ছেলেরা বরং স্কুল কামাই করিবে, তথাপি জুতা ছাড়া খালি পায় হাঁটিয়া একদিনও স্কুলে যাইবে না। সে

জুতাই কি দুই এক টাকায় হয়? ৪।৫ টাকা যোড়ার হান্টিং বুট বা ডসনের সু চাই, দেড় টাকা দুই টাকা মূল্যের চটি জুতায় আর চলে না। তা'তেও আবার ব্রস্কো, ব্ল্যাস্কো এবং কালী ব্রাস ইত্যাদি কত কি যে সরঞ্জামের দরকার! আমরা মোজা আদৌ ব্যবহার করিতাম না, ছাত্রদের পক্ষে উহা অত্যন্ত বাবুগিরি বলিয়া বিবেচিত হইত। বাবু সাজিয়া গুরুজনের সম্মুখে বাহির হইতে বড় লজ্জা বোধ করিতাম। ময়মনসিংহ সিটীস্কুলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ হেড্ মাষ্টর বাবু গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী যখন জেলা স্কুলের প্রথমশ্রেণীতে পড়িতেন, তখন তাঁহার এক পায় একটু বাতের বেদনা হইয়াছিল; ডাক্তার তাহা গরম কাপড়ে জড়াইয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন। তাহাতে সেই ভদ্রলোক এক জোড়া গরম মোজা সংগ্রহ করিয়া তাহার একখানামাত্র পীড়িত পায় ব্যবহার করিয়া স্কুলে যাতায়াত করিতেন, অপর পায় মোজা লাগাইতে ভরসা করিতেন না। বর্ত্তমান সময়ে কেহ ঐ বেশে স্কুলে গেলে অপর ছাত্রগণ হয় তো তাঁহাকে লুনাটিক এছাইলামে (Lunatic Asylum) পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে! দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড় ব্যবহার করিয়া সেকালে ছেলেদের স্বাস্থ্য বেশ ভালই থাকিত। তাহাদের পায় মোজা, গায় ফ্লানেলের সার্ট, চোখে চসমা এবং মাথায় অডিকলনের কোন প্রয়োজনই হইত না। এ সকল দ্রব্য ব্যবহার করা সেকালে বার্দ্ধক্যের লক্ষণ বলিয়াই বিবেচিত হইত। ডাক্তার এবং ঔষধের ব্যয় বহন করিয়া, এবং মাঝে মাঝে জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দূরদেশে পাঠাইয়া, ছেলেদের স্বাস্থ্য সংশোধন করিয়া আনিবার খরচ সেকালে মোটেই লাগিত না। ইহাতে দরিদ্র বিধবার ছেলেরাও তখন কেবল পরকীয় সাহায্যেই উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া মানুষ হইয়া আসিতে পারিত। এখন এক এক ছেলের পিতা, মাতুল, কি শ্বশুর খরচ যোগাইয়া যোগাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন, তথাপি সকলকে

মানুষ করিয়া তুলিতে পারিতেছেন না। এখনকার ছাত্রদের শিক্ষিত অভিভাবক আছেন, তাঁহারা ছেলেদের সুবিধা অসুবিধা বুঝিতে পারেন, এবং তাহাদের সুখ দুঃখের বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন। সেকালের ছাত্রদের এ সব সুবিধা কিছুই ছিল না। অনেককেই পরের বাসায় থাকিয়া বহুকষ্টে পড়াশুনা করিতে হইত, কাহাকেও বা মুদীর দোকানেও অবস্থিতি করিতে হইত। পরের বাসা আর নিজের বাসা, অবস্থা সর্ব্বত্রই একরূপ ছিল। ছাত্রদের থাকিবার, কি বসিয়া পড়িবার জন্য চেয়ার টেবিল দূরে থাকুক, নির্দ্দিষ্ট একটা স্থানও থাকিত না; প্রত্যেক বাসায়ই এক একটা ফরাশের বিছানা থাকিত; বাসার কর্ত্তা তাহাতে বসিয়া বিষয়কার্য্য করিতেন, ছেলেরাও তাহারই এক কোণে বসিয়া লিখা পড়া করিত। তাহাদের লেপ, তোষক, বিছানা বালিশের বড় একটা বন্দোবস্ত থাকিত না। সেই ফরাশেই কেহ বা কর্ত্তার তাকিয়াটা টানিয়া লইত, কেহ বা কেতাব শিয়রে দিয়াই শুইয়া পড়িত। সেই ফরাশের উপরে কত মত্ত মাতালের, কত শিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এবং কত কন্যাদায়গ্রস্ত অতিথির চরণধূলিতে যে আমাদিগকে লুটাইতে হইত, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ফরাশের উপরে পাতিয়া শুইবার জন্য একখানা বিছানার চাদর, একখানা ছোট মশারি ও একটী বালিশ, এবং শীতকালে একখানা লেপের বন্দোবস্ত থাকিলেই কিন্তু এই অসুবিধা দূর হইত, কিন্তু সে দিকে কেহ দৃষ্টিপাতও করিত না। শীতকালে একটা বনাত, কি একটা মোটা গেলাপ মিলিত বটে, কিন্তু তাহাতে শীত দূর হইত না। বাসার খানসামা চাকরের তখন বড়ই আধিপত্য ছিল, বাসার ছাত্রগণ তাহাদিগকে অত্যন্ত ভয় করিয়া চলিত। রাত্রে পড়িবার জন্য প্রদীপে একটুকু তৈল দেওয়ার নিমিত্ত খানসামাকে "দাদা গো! দাদা গো!" বলিয়া কতই না ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছি! খানসামাদের সঙ্গে বসিয়া তাস খেলিতে সম্মত না হইলে

তাহারা প্রদীপে তৈল দিতে স্বীকার করিত না। বাধ্য হইয়া তাহাই স্বীকার করিতে হইত; এবং যে পর্য্যন্ত অন্যান্য বাসা হইতে খেলোয়াড় আসিয়া না যুটিত, সে পর্য্যন্ত ২।১ বাজি খেলিতেই হইত। তারপর খেলোয়াড় আসিবামাত্র আমি সরিয়া পড়িতাম, এবং কেতাব লইয়া তাহাদেরই পাশে বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিতাম। সেকালে এরূপ অবস্থাতেও বেশ পড়াশুনা হইত। একালে জুয়েল ল্যাম্প এবং চর্ব্বিবাতির আলোকে, চেয়ার টেবিলে, নির্জ্জন কুঠরিতে বসিয়াও সেরূপ শিক্ষা হয় কি না সন্দেহ!

সেকালের ছাত্রগণের উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের সহিত একালের ছাত্রদিগের অলসতার তুলনা করা যাইতে পারে। টোলের পড়ুয়াগণ তুলট করা কাগজে বাঁশের কলম দিয়া বড় বড় পাঠ্য পুঁথি সকল নকল করিয়া লইত। আমরা স্কুলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বাড়ীতে যখন "জাংরী" কাগজে মক্স করিতাম, তখন শনির পাঁচালী, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, মঙ্গলচণ্ডীর পুঁথি প্রভৃতি বার বার নকল করিতাম; তাহাতে হাতের লেখাও ভাল হইত, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচালীও মুখস্থ হইয়া যাইত। তারপর স্কুলে পড়ার কালে আমরা কখনও অর্থপুস্তক বা Key খরিদ করি নাই। অভিধান দেখিয়া সকল অর্থ নিজেরা লিখিয়া লইয়াছি। পাঠ্যপুস্তকের কোন কঠিন অংশের ব্যাখ্যা, কিম্বা আনুসঙ্গিক বাহিরের কোন দৃষ্টান্ত বা গল্পের কথা শিক্ষকমহাশয় বলিয়া দিলে, তাহা নোটবুকে লিখিয়া লইয়াছি। প্রাইভেট মাষ্টার রাখিয়া ঘরে পড়া শিখার প্রথা তখন নিতান্ত বিরল ছিল, বড় বড় রাজা জমিদারের ছেলেদের জন্যই সেরূপ শিক্ষক রাখা হইত, শুনিতাম। সেকালে নসিরাবাদ (ময়মনসিংহ) সহরে Webster's Dictionary দুইখানা মাত্র ছিল; একখানি জেলা স্কুলে, আর একখানা গবর্ণমেণ্ট প্লীডার বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের

বাসায়। আমরা সকলে Reid's ডিক্সনারী ও Walker's ডিক্সনারী দেখিয়া অর্থ লিখিতাম। Samuel Johnson সাহেবের লিখা রাসেলাস Rasselas এণ্ট্রান্স কোর্সের পাঠ্য ছিল। "It was said of Dr. Johnson, that he never used a word of two syllables, where it was possible to use a word of six syllables." একদিন অর্থ লিখিতে বসিয়া আমাদের সেই ছোট ছোট ডিক্সনারীতে একটা শব্দের অর্থ পাইলাম না, তাহার জন্য ওয়েবষ্টারের ডিক্‌সনারী দেখিতে আমি পূর্ণবাবুর বাসায় গিয়াছিলাম। সে বাসা ছিল আমাদের বাসা হইতে অন্যূন অর্দ্ধমাইল দূরে! আমি একটা শব্দের অর্থের জন্য এতটা পথ হাঁটিয়া গিয়াছি দেখিয়া, আমাদের বর্ত্তমান সুযোগ্য উকিল মিষ্টভাষী ক্ষিতিশবাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর যোগেশ বাবু (যিনি এখন হাইকোর্টে ওকালতী করেন), একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি একটা শব্দের অর্থের জন্য এতদূর হইতে ডিক্‌সনারী দেখিতে আসিয়াছেন?"

সেকালের ছাত্রদিগের আর একটা বিষম বিপদ এই ছিল যে, তাহাদের অনেককেই পালা মত রান্না করিতে হইত। ব্রাহ্মণের তো কথাই নাই, কায়স্থ ভদ্রলোকদের ছেলেদিগকেও আপন আপন বাসায় সকল লোকের জন্য মধ্যে মধ্যে রান্না করিতে হইত। বাসায় বাসায় পাচক ব্রাহ্মণ রাখিয়া পাক করাইবার প্রথা তখন প্রচলিত ছিল না, এবং খানসামা চাকরের হাতেও ভদ্রলোকেরা তখন খাইতেন না; কাজে কাজেই ছাত্রদিগকে সর্ব্বদা সে কাজ করিতে হইত। অনেকে যৎসামান্য কিছু লেখা পড়া শিখিয়াই স্কুল ছাড়িত, এবং বিষয়কার্য্যের চেষ্টা করিত। তাহাদিগকে বলিত "উমেদার", অর্থাৎ—কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী। এই উমেদার শ্রেণীর লোক প্রায় সকল বাসাতেই দুই চারি জন করিয়া

থাকিত, তাহারা যখন যে আপিসে কোন কাজ উপস্থিত হইত, তখন সেই খানে যাইয়া ঠিকা বা "একটিনী" করিত। ইহারাও বাসায় ছাত্রদের সঙ্গে 'পালা' করিয়া (পর্য্যায়ক্রমে) রন্ধনের কাজ করিত। কিন্তু ইহাদিগের দ্বারা ছাত্রদের বিষম অনিষ্ট উপস্থিত হইত। ছাত্রেরা এই উমেদারদের সংসর্গ ছাড়াইতে পারিত না, উহারা স্কুল ছাড়িয়াছে বলিয়া স্বাধীনভাবে চলিয়া ছাত্রদিগের উপরে অকারণ আধিপত্য খাটাইত, এবং তাহাদের সম্মুখে নানা প্রকারে কুদৃষ্টান্ত উপস্থিত করিত; এমন কি অনেক স্থলে প্ররোচনা ও প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে কুপথগামী করিবার চেষ্টাও করিত। নিতান্ত সুখের বিষয় যে, এখন ছাত্রদের সে আশঙ্কা নাই।

১৮৬৮ সাল—সেকালে জমিদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের ছেলেদিগকে সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে একত্রে মিশিয়া একাশনে বসিয়া লেখাপড়া শিক্ষার জন্য পব্‌লিক স্কুলে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হইতেন। তাহাতে মানের লাঘব হয় বলিয়া মনে করিতেন এবং নীচ সংসর্গে কোন কোন বিষয়ে ছেলেদের অবনতির আশঙ্কাও করিতেন। কিন্তু সেরপুর টাউনের অন্যতম জমিদার বাবু গোলকমোহন চৌধুরী মহাশয় সে অভিমানের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহার পুত্র বাবু মদনমোহন চৌধুরীকে পব্‌লিক স্কুলে পাঠাইয়াছিলেন এবং মদনমোহন বাল্য কালেই সৎসাহসের পরিচয় দিয়া তাঁহার সমশ্রেণীস্থ ভূম্যধিকারীগণের পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন।

এই মদনমোহন চৌধুরীর জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হওয়া সম্বন্ধে ঐ সনের শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টে ঢাকা হইতে স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টার সাহেব লিখিয়াছেন—

"The Local committee of public Instructions at Mymensingh reports,—It is a matter of novelty, that a

Zeminder boy of Sherpur has joined the Zillah school, with a minor scholarship."

১৮৬৭ সাল—তখন ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি তাহা জানিতাম না। কিন্তু নূতনে ও পুরাতনে যে একটা সঙ্ঘর্ষণ উপস্থিত হইতেছে তাহা অনুভব করিতাম। দেখিতাম পুরাতন ছাড়িয়া নূতনের দিকে যাইবার জন্য প্রাণের টান, শুধু আমার নহে, সমসাময়িক অনেকেরই। কিন্তু কোন্ খানে পুরাতন ছাড়িয়া নূতন ধরিতে হইবে, পুরাতন কোন্টা কি প্রকারে ছাড়িব, নূতন কোন্টা কিরূপে ধরিব তাহা নিজেও বুঝিতাম না, বুঝাইয়া দিবার অন্য লোকও ছিল না। সুবিজ্ঞ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেন কিশোরগঞ্জের সবডিভিসনেল অফিসার ছিলেন। তখন সেই মহকুমা (সবডিভিসন) মাত্র অল্পদিন যাবৎ খোলা হইয়াছে; রাস্তা ঘাট, অফিস হাট, সমাজ সভ্যতা আদব কায়দা সকলই রামশঙ্কর বাবুকে নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে ও সকলকে শিক্ষা দিতে হইয়াছিল। উপযুক্ত হস্তেই উপযুক্ত বিষয়ের ভার অর্পিত হইয়াছিল। তিনি স্থির ধীর ও প্রশান্ত ভাবে সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার তীব্র শাসনে এলাকার যত দুর্দ্দান্ত লোক সর্ব্বদা সন্ত্রাসিত থাকিত অথচ তাঁহার সদ্ব্যবহার ও সদুৎসাহে শিক্ষিত ভদ্র সন্তানেরা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট যাইত। বাঙ্গলা ভাষায় যে সকল লিখা পড়া হইত তাহা শুদ্ধরূপে লিখা তথনকার লোকের অভ্যাস ছিল না; হ্রস্ব, দীর্ঘ ও ষত্ব ণত্ব বোধ অনেকেরই ছিল না। বাবু রামশঙ্কর সেন কোথাও ব্যঙ্গ করিয়া, কোথাও মিষ্ট শাসন করিয়া, কোথাও উপদেশ দিয়া সকলকে শুদ্ধ বাঙ্গলা লিখিতে শিখাইতেন। যাহারা কখনও কোন স্কুলে পড়ে নাই তাহারাও তাঁহার নিকট কোন কাগজ লিখিয়া উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে শুদ্ধরূপে লিখা হইয়াছে কিনা তাহা অপর কেহকে দেখাইয়া লইত; একবারে "গুরুদাস"

"চোরমনী" "তক্রবাগিশ" "চর্কবর্ত্তি" লিখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে সাহস করিত না।

সে সময়ে মাজিষ্ট্রেট যাহাকে সার্টিফিকেট দিতেন সে-ই মোক্তার হইতে পারিত। কোন বুদ্ধিমান (intelligent) ভদ্রসন্তান সেজন্য রামশঙ্কর বাবুর নিকট উপস্থিত হইলে তাহাকে কোন বহুদর্শী প্রাচীন মোক্তারের অধীনে মোহরের রূপে কাজ করিতে দিয়া, কিছু শিক্ষা হইলে পর, মোক্তারি সার্টিফিকেট দিতেন। নিতান্ত বোকা কেহ উপস্থিত হইলে তাহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া তাড়াইয়া দিতেন। শেষোক্তরূপ একটী লোক একবার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার বিদ্যাবত্তা তিনি অনুমানে বুঝিতে পারিয়া বলিলেন 'মৃত্যুঞ্জয়' কেমন করিয়া লিখিবে বল দেখি, তবেই তোমাকে মোক্তারীতে পাশ করিয়া দিব"—কিন্তু সে বেচারা তাহা পারিল না, তাহার নানারূপ প্রয়াস দেখিয়া কাছারীতে হাসির রোল পড়িয়া গেল।

সবডিভিসনেল অফিসার বাবু রামশঙ্কর সেনের বাসায় রবিবার সন্ধ্যার পর সভা বসিত। শুনিতাম সেখানে তিনি নিজে বই দেখিয়া স্তোত্রাদি পাঠ করিতেন, স্কুল মাষ্টার ও পণ্ডিত প্রভৃতি দুই চার জন লোক উপস্থিত থাকিতেন, কোর্ট সব ইন্‌স্পেক্টার তবলা বাজাইয়া গান করিতেন। ইহার নাম ছিল 'ব্রহ্ম সভা'; উপাসনা শব্দ তখন পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, অন্ততঃ আমরা শুনিতে পাই নাই। এই সভায় আমাদের যাইতে সাহস হইত না, কেহ যাইতে বলিতও না। আমাদের স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট এই সভা সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ আমরা স্কুলেই শুনিতে পাইতাম।

মহেশ বাবু ও গোবিন্দ বাবু সেকালের সংস্কারকদিগের অগ্রণী ছিলেন। সংস্কারক বলিয়া তখনও কোন দলের সৃষ্টি হয় নাই, তাহার

পন্থাও কেহ জানিতেন না সুতরাং অনেক সময়ে অনেক বিষয়েই তাঁহারা বিপন্ন ও উৎপীড়িত হইতেন।

কিশোরগঞ্জের প্রসিদ্ধ ঝুলনমেলার বাজার হইতে উক্ত মাষ্টার মহাশয় তালতলার এক জোড়া হল্‌দে রঙের চটী জুতা খরিদ করিয়া বলিলেন "এবার কার্ত্তিকের খালের জুতা কিনিয়াছি।" সেই সময়েই দেখিলাম রামশঙ্কর বাবুর পায় এক জোড়া চটী জুতা একেবারে টুক্‌টুকে লাল, তখন হাসিতে হাসিতে বলিলাম "ইহাকে হয়তো আপনারা গণেশের চামড়ায় বলিবেন"—শুনিয়া তিনিও হাসিলেন। এরূপ ব্যবহার দ্বারা হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রাচীন লোকদের প্রাণে অকারণ কেবল ব্যথা দেওয়া হয় মাত্র, তাহাতে সমাজ সংস্কারের বা ধর্ম্ম প্রচারের কাজ কিছুমাত্র অগ্রসর হয় না। ঐরূপ অবিমৃষ্যকারীতার ফল এই হইল যে কিশোরগঞ্জে এক জনরব উঠিল মহেশ বাবু ও গোবিন্দ বাবু হয়বৎনগরের দেওয়ান সাহেবের বাড়ীতে খানা খাইয়াছেন। সমাজে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইল, তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য পীড়াপীড়ি চলিতে লাগিল।

ময়মনসিংহ হইতে "বিজ্ঞাপনী" নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইত। তাহাতে প্রকাশিত হইল, "কিশোরগঞ্জে দলাদলীর আবর্ত্ত উঠিয়াছে, তাহাতে পড়িয়া কোন কোন শিক্ষক হাবুডুবু খাইতেছেন, কিছুকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিলে আবর্ত্ত চলিয়া যাইবে।" শেষে তাহাই হইয়াছিল।

হেডমাষ্টার বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই যে, তিনি তখনকার দিনের একজন Junior scholar ছিলেন। মহেশবাবু বিক্রমপুরের কোন পল্লীগ্রামস্থ একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান। তিনি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিলেন, এক জেঠাই মা ব্যতীত সংসারে তাঁহার

আর কেহ ছিল না। হয়বৎনগরের জমিদার দেওয়ান সাহেব এবং তাঁহার কর্ম্মচারী দেওয়ান মুন্সী প্রভৃতির চেষ্টায় হয়বৎনগরে একটী স্কুল খোলা হয়, মহেশ বাবু মাসিক ৪০৲ চল্লিশ টাকা বেতনে সেই স্কুলের হেড মাষ্টার নিযুক্ত হইয়া আসেন। বাবু রামশঙ্কর সেন মহাশয়ের সময়ে সেই স্কুল হয়বৎনগর হইতে উঠাইয়া কিশোরগঞ্জে আনা হয় এবং তিনি তাহার সম্পাদক হন। পরে এই স্কুলের নানাবিধ উন্নতি হইয়াছে। ইংরেজী সাহিত্যে মহেশ বাবুর এমন দখল ছিল যে তাহা দেখিয়া নূতন পাশ করা B.A., ও M.A., অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। তিনি অতি বুদ্ধিমান ও উচিৎ বক্তা এবং বিদূষক লোক ছিলেন। তাঁহার মিতব্যয়ী স্বভাব কার্পণ্যে পরিণত হইয়াছিল, সেজন্য অপরিণামদর্শী ও অপব্যয়ী অনেকে তাঁহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত—তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না।

তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল এবং শিক্ষা প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট ছিল। তাঁহার কাছে মাইনর স্কুলে ছাত্রদের যেরূপ ইংরেজী শিক্ষা হইত এখনকার কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যেও অনেকের সেরূপ হয় না।

গোবিন্দ বাবুরও একটুকু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইনি একজন সুলেখক ও কবি ছিলেন—বিক্রমপুরের কুলীন ব্রাহ্মণ—নাম গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্কুলের পণ্ডিতী কাজে সে স্থানে গিয়াছিলেন কিন্তু গুণগ্রাহী রামশঙ্কর বাবু যেখানে একটী ভাল লোক পাইতেন সেখান হইতেই তাহাকে আনিয়া তাঁহার আফিসে কাজ দিতেন। এই ভাবে গোবিন্দবাবুকে এবং বাবু রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক আরো একজন স্কুল মাষ্টারকে আনিয়া তিনি আফিসে কাজ দিয়াছিলেন। তাঁহারা দুজনেই পরে ওকালতী পরীক্ষায় পাশ করিয়া হোসেনপুরের মুন্সেফী আদালতে উকীল হইয়াছিলেন।

গোবিন্দ বাবু "কুলীন কুলাঙ্গণা" কাব্যে লিখিয়াছিলেন—

ওরে ও কৌলীন্য দুরাচার, তুই শুধু পাপের আধার,
কতগুলি কুলাঙ্গার, পূজি তোরে অনিবার,
মোদের দুঃখের নদী করেছে অপার।
ছাড়রে কৌলীন্য ছাড় বঙ্গ অধিকার
তা না হলে পদাঘাতে ভেঙ্গে দিব হাড়
তোর ভেঙ্গে দিব হাড়॥"

তাঁহার "পদ্মপ্রভার"

"কে করেছে মানবের মুখশশি রচনা?
সুনীল গগনোপরে, শারদীয় শশধরে,
যেই জন কৃপা করে, করিয়াছে স্থাপনা।
সে করেছে মানবের মুখশশি রচনা॥

"কে করেছে মানবের বাহু যুগ রচনা?
গড়িয়া মৃণাল নাল, বেড়িয়া কণ্টক জাল,
জলে রাখি চিরকাল যে দিতেছে যাতনা
সে করেছে মানবের বাহু যুগ রচনা॥"

প্রভৃতি কবিতাগুলি যে তখন পড়িতাম আর মুখস্থ হইয়া যাইত তাহা অদ্যাপি ভুলিতে পারি নাই।

ময়মনসিংহ। জেলা স্কুলে ছাত্রদিগকে স্বাধীন ভাবে বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষাতে রচনা লিখিতে ও বক্তৃতা করিতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ক্লাসে ক্লাসে Literary club ছিল। প্রতি শনিবারে ছাত্রগণ সেই সভায় রচনা পাঠ ও নির্দ্ধারিত কোন বিষয় নিয়া তর্ক বিতর্ক করিত। সে সকল রচনা ও বক্তৃতাতে ভ্রম প্রমাদ যাহা থাকিত ক্লাসের শিক্ষকগণ তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন।

ঐ স্কুলে "মনোরঞ্জিকা ক্লব" নামে আর এক সভা ছিল। প্রতি রবিবার অপরাহ্নে তাহার অধিবেশন হইত এবং তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসের ভাল ভাল ছাত্রগণ যোগ দিত। সেখানে নির্ব্বাচিত পুস্তকাদি হইতে ঈশ্বর স্তোত্র পাঠ, পরে নীতিপূর্ণ বিষয় অবলম্বন করিয়া ইংরেজী ও বাঙ্গালাতে পাঠ ও বক্তৃতা হইত। বঙ্গদেশের অমূল্যরত্ন, ব্রাহ্মসমাজের আদরের ধন, ময়মনসিংহের মুকুটমণি স্বনামধন্য আনন্দমোহন বসু এই মনোরঞ্জিকা সভার সভ্য ছিলেন। ঢাকার নববিধান সমাজের প্রধান প্রচারক বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় এই সভার উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ইদানিন্তন কালেও ইঁহারা যখন ময়মনসিংহ নগরে গমন করিয়াছেন তখন অনেক স্থলে এই সভারই কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাতে ছাত্রগণের কিরূপ শিক্ষা হইত তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের গোলকনাথ ধর নামক জনৈক ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করা কালে Todhunter সাহেবের Algebra পুস্তকের একটা Problem মধ্যে উক্ত গ্রন্থকারের ভুল ধরিয়া তাঁহার কাছে ইংলণ্ডে চিঠি লিখিয়াছিলেন। সাহেব তদুত্তরে তাঁহার ভুল স্বীকার করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, গণিত শাস্ত্রে গোলকনাথের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া সাহেব অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "ভারতে পুনরায় খণা ও লীলাবতীর কাল আসিবে।" আমরা মনোরঞ্জিকা ক্লাবে যাইয়া এই সকল কীর্ত্তি কাহিনী শুনিতে পাইতাম এবং তাদৃশ ছাত্রগণের যে সকল উৎকৃষ্ট রচনা প্রবন্ধ-সভায় পঠিত হইয়া লাইব্রেরীতে রক্ষিত হইত সে সকল পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইতাম ও কত শিক্ষা লাভ করিতাম।

এই মনোরঞ্জিকা সভা হইতেই ছাত্রগণ ব্রাহ্মসমাজের জন্য প্রস্তুত হইত। এখানেই ছাত্রদিগের চরিত্র গঠিত হইত। হিন্দুসমাজের প্রাচীন

নেতাগণ ইহার কোন সংবাদ রাখিতেন না। পরে যখন "হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিণী সভার" এক শাখা-সভা দুর্গাবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইল তখন গোঁড়া হিন্দু বাসার ছাত্র সকল—যাহারা অভিভাবকের ভয়ে অন্য কোন সভায় যাইতে পারিত না—তাহারা যাইয়া ঐ শাখা খুব জাঁকাইয়া তুলিল। তাহারা মনোরঞ্জিকা সভার বিনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া দুর্গাবাড়ীতে এবং বাসায় বাসায় কর্ত্তাদিগকে জানাইতে লাগিল যে মনোরঞ্জিকা সভা বন্ধ করিতে না পারিলে হিন্দুসমাজের আর রক্ষা নাই। কারণ এখান হইতেই ছাত্রসকল প্রস্তুত হইয়া গিয়া ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গ পরিপুষ্ট করে। তখন সহরে দলাদলির প্রবল প্রভাব। বাসার অভিভাবকগণ ছাত্রদিগকে পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে যাইতে যেমন নিষেধ করিতেন এখন মনোরঞ্জিকা ক্লাবে যাইতেও সেইরূপ নিষেধ করিতে লাগিলেন। মনোরঞ্জিকা সভা ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল ও পরিশেষে এককালে বিলুপ্ত হইল। হিন্দুসমাজের শাসনে ছাত্রগণ ইহাতে যাতায়াত রহিত করিল, তাহাদের মধ্যে যাহার যাহার অবস্থা বা অভিভাবক অনুকূল তাহারা ব্রাহ্মসমাজের শাখা সভায় যাইয়া প্রবেশ করিল। তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত বল, অভিনব উৎসাহ ও অমিত তেজ। কান্তিবাবু, অঘোরবাবু ও গৌরগোবিন্দবাবু প্রভৃতি সুপণ্ডিত ও ধর্ম্মপ্রাণ প্রচারকগণ ক্রমান্বয়ে বার বার আসিয়া ব্রাহ্মসমাজের শাখা ও মূলসভার সভ্যগণমধ্যে এবং বাহিরের সর্ব্বসাধারণ লোকের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় অগ্নি বিকীর্ণ করিতেন। ইঁহাদের জীবন্ত দৃষ্টান্তে, চিত্তোন্মাদিনী বক্তৃতা, উপাসনা ও উপদেশে লোক সকল ছুটাছুটী করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আকৃষ্ট হইয়া আসিত। তখন গোঁড়া হিন্দুর বাসার লোকদিগের, বিশেতঃ ছাত্রগণের কত কষ্ট! কত লুকোচুরি করিয়া, কত সঙ্কুচিত ও শঙ্কাযুক্ত চিত্তে, সোজা পথের পরিবর্ত্তে কত ঘুরিয়া ফিরিয়া দূরবর্ত্তী পথে ইহাদিগকে ব্রহ্মমন্দিরে যাইতে হইত!

সেই সময়ের কত কষ্টকর ও কত আমোদজনক ঘটনার কথাই এখন মনে পড়িতেছে। বাবু মদনমোহন ঘোষ একজন শ্রদ্ধাবান্ ও শ্রদ্ধেয় প্রাচীন হিন্দু, তিনি জজ কোর্টের ট্রান্স্‌লেটার—Translator—ছিলেন। তাঁহার পরিবারস্থ যে-সকল ছেলে তাঁহার বাসায় থাকিয়া স্কুলে পড়িত তাহারা কেহই ব্রাহ্মসমাজে যাইত না। কিন্তু সেই বাসার হরিমোহন বসু নামে নর্ম্যাল স্কুলের একটী বয়স্ক ছাত্র মদনবাবু এবং তাঁহার ভ্রাতাদের জ্ঞাতসারেই ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগ দিতেন। তাহাতে কোন বাধা ছিল না—কেবল ব্রাহ্মদিগের সহিত আহারাদি নিষেধ ছিল। কালেক্টরীর পেস্কার বাবু আনন্দনাথ ঘোষের বাসা উক্ত মদনবাবুর বাসার সহিত পরস্পর সংলগ্ন। আনন্দবাবু তখন আনুষ্ঠানিক ও উন্নতিশীল ব্রাহ্ম যুবকদিগের মধ্যে একজন অত্যগ্রগামী। একদিন মদনবাবুর ছেলের সহিত আনন্দবাবুর ছেলের তর্ক বিতর্ক হইতেছিল। দুজনেই ছোট ছোট বালক, খেলাধুলার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলেও পড়ে। সে দিন মদনবাবুর ছেলে কি-যেন একটা মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, তাহার জন্য আনন্দবাবুর ছেলে তাহাকে অনুযোগ করিতেছিল ও মন্দ বলিতেছিল। মদনবাবুর ছেলে তাহাতে কহিল,—"কেন রে, মিথ্যা কথা বলিয়াছি তো কি হইয়াছে? আমরা তো আর তোদের মত ব্রাহ্ম নই, যে মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না?" মদনবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু গঙ্গাধর ঘোষ প্রাচীন ক্লাসের চরিত্রবান উকীল, তিনি ঐ বালকদ্বয়ের সেই বাদানুবাদ তাহাদের অগোচরে থাকিয়া স্বকর্ণে শুনিলেন। শৈশবকাল হইতে বালকদিগের এরূপ সংস্কার জন্মিতেছে যে হিন্দুর ছেলের মিথ্যা কথা বলিলে কোন দোষ হয় না, ইহা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইল। তিনি সেই দিবসই বাসার ব্রাহ্ম ছাত্র হরিমোহনকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "তুমি এখন হইতে আমাদের বাসার ছেলেদিগকে তোমার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া যাইও।"

আনন্দবাবুর পিতা-ঠাকুর প্রাচীন বয়সে কাশীবাসী হইয়াছিলেন। তিনি সেখানে থাকিয়া পুত্রকে একবার দেখিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন এবং সে জন্য আনন্দবাবুকে একবার কাশীধাম যাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই উন্নতিশীল ব্রাহ্মযুবক প্রত্যুত্তরে পিতার কাছে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "আপনাকে দেখিতে ও দেখা দিতে কাশী পর্য্যন্ত যাইতে পারি, কিন্তু সেখানে গেলে পর যে সেই অশ্লীল শীলাখণ্ডকে প্রণাম করিতে বলিবেন তাহা আমি পারিব না।" কাশীর বিশ্বেশ্বর পাষাণময় শিবলিঙ্গ—আনন্দবাবু তাহাকেই "অশ্লীল শীলাখণ্ড" বলিয়াছিলেন। আনন্দবাবুর পিতা সেই পত্র পাইয়া কি করিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু পরিশেষে স্ত্রী-বিয়োগ হইলে এই আনন্দবাবু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেশের অবস্থা যখন এইরূপ তখন মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কিশোরগঞ্জে উপস্থিত হইলেন। প্রচারক ও প্রচার কার্য্য কাহাকে বলে তাহা কেহ জানিত না। বাবু রামশঙ্কর সেন তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও যত্ন করিয়া আপন বাসায় রাখিলেন এবং স্কুল ঘরে একটা বক্তৃতার আয়োজন করাইয়া দিলেন।

একজন ব্রহ্মজ্ঞানী আসিয়াছে—সে ঈশ্বর সম্বন্ধে ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিবে এইরূপ বলাবলি হইতে লাগিল। মফঃস্বলের একটি ভদ্রলোক মোকদ্দমার কার্য্য উপলক্ষে কিশোরগঞ্জে গিয়াছিলেন, তিনি আমাকে বলিলেন—"কি ভায়া! তোমাদের তো একজন আসিয়াছে—কি জানি বলে?" আমি বলিলাম—"দাদা! একবার সেই বক্তৃতা শুনিতে যাইবেন, মনের অন্ধকার ঘুচিয়া যাইবে।" তখনই আবার মনে মনে ভয় করিয়া বলিলাম, "না, আপনাদের মনের অন্ধকার যেরূপ গভীর তাহা কি ঘুচিবে? যাহা হউক তথাপি বক্তৃতা শুনিতে অবশ্য অবশ্য যাইবেন।"

বক্তৃতা হইল, প্রকাণ্ড স্কুলঘর ভরিয়া লোক বসিয়া ও দাঁড়াইয়া ছিল, সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নীরবে সেই বক্তৃতা শুনিল। তেমন সুমিষ্ট বিশুদ্ধ ভাষা ইতিপূর্ব্বে আমরা কখনও শুনি নাই, একটা লোক ঘণ্টা-দুই কাল দাঁড়াইয়া কোন কাগজ বা পুঁথি পত্র না দেখিয়া অনর্গল বলিয়া যাইতে পারে, এমন আর কোথাও দেখি নাই। আমরা তো শ্রদ্ধা সহকারে, আশান্বিত হৃদয়ে শুনিতে গিয়াছিলাম, আমাদের ভাল লাগিবারই কথা, বিরুদ্ধ মত লইয়া যাহারা গিয়াছিল তাহারাও বক্তার যুক্তিপূর্ণ ও শাস্ত্রানুমোদিত উক্তি সকল শুনিয়া মনে মনে পরাস্ত না হইয়া পারিল না।

সভাসমিতি ও তাহার নিয়ম প্রণালী তখন পর্য্যন্ত এদেশে প্রচলিত হয় নাই। রামশঙ্করবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরিজাশঙ্কর সেন,—যিনি পরে ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন,—তখন ঢাকা কলেজে পড়িতেন। তিনি বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শেষ করিয়া গোস্বামী মহাশয় উপবেশন করিবামাত্র হেড মাষ্টার বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "আমি প্রস্তাব করি বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যে দূরদেশ হইতে পরিশ্রম করিয়া আসিয়া এরূপে বক্তৃতা দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হউক।" তখন উক্ত গিরিজাবাবু দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমি এই প্রস্তাব অনুমোদন করি।" তাহাতে গোস্বামী মহাশয় আবার উঠিয়া বলিলেন, "আমি প্রস্তাবককে বল্‌ছি গো, আমি ধন্যবাদ পাবার জন্য এখানে বক্তৃতা কর্ত্তে আসি নাই, যাহা সত্য যাহা ধর্ম্ম, তাহা লোক সমাজে প্রচার করা কর্ত্তব্য, সেই কর্ত্তব্য বোধ ক'রে আমি এখানে এসে যা কিছু বলেছি তার জন্য ধন্যবাদ চাইনে।" তখন মাষ্টার মহাশয় ও গিরিজাবাবু মনে করিলেন "কি গুরুতর অপরাধই না-জানি করিয়া ফেলিয়াছি।" তাঁহারা এসব নিয়ম কিছুই জানেন না এই মর্ম্মে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

পরদিন বক্তৃতার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। আমার সেই ভদ্রলোককে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি দাদা, কেমন শুন্‌লে ?" তিনি উত্তর করিলেন, "না ভাই, আর কিছু বলিবার নাই, বক্তৃতা অতি উত্তম হইয়াছে।"

কাছারীতে যশোদল নিবাসী কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কার্য্যোপলক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা রামশঙ্কর বাবুকে বলিলেন যে এমন সুন্দর বক্তৃতা হইল অথচ তাঁহাদিগকে তাহা শুনিতে দেওয়া হইল না কেন ? যশোদল গোস্বামী ও ভট্টাচার্য্যদিগের বাসস্থল। গুরুগিরিই তাঁহাদিগের ব্যবসায়। সে গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আগ্রহান্বিত হইয়া বিজয় বাবুর বক্তৃতা শুনিতে চান দেখিয়া রামশঙ্কর বাবু আহ্লাদিত হইলেন এবং সেই দিনই চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক সকলকে সংবাদ দিয়া বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিলেন। কাছারী ও স্কুল তাড়াতাড়ি বন্ধ করা হইল। সন্ধ্যার পর বক্তৃতা হইল, তাহাতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। বক্তৃতা সুদীর্ঘ এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

কিশোরগঞ্জ টাউনের মধ্যে কাটাখালি গ্রামে প্রামাণিকদিগের বাস। তাহাদের বাড়ীতে 'একুশ রত্ন' প্রভৃতি মঠমন্দির দেখিবার জিনিস ছিল এবং সেই প্রামাণিকদিগের বিবরণ ইতিহাসের বিষয় ছিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সেই প্রামাণিকদিগের বাড়ীখানা দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। রামশঙ্কর বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু তারকনাথ সেন, স্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে এক বাসায়ই থাকিতেন, তিনি বিজয় বাবুর সঙ্গে যাইয়া তাঁহাকে প্রামাণিকের বাড়ী দেখাইতে চলিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের পরিধানে একখানা সামান্য থানের ধুতি হাঁটু পর্য্যন্ত নামিয়াছে, গা'য় একখানা সামান্য চাদর—আর কিছু নাই। দাড়ি গোঁফ কামান, পায় জুতা নাই। এই সাত্ত্বিক বেশে সাধু

পুরুষ হাঁটিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পথপ্রদর্শক তারক বাবু একটী পূরা সাহেব, তিনি কোট প্যাণ্ট পরিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া চলিলেন। রামশঙ্কর বাবু কাছারীতে বসিয়া তাহা দেখিলেন এবং উঁহারা কিছু দূর যাইতে না যাইতে তিনি ছুটিয়া স্কুল ঘরে গেলেন, যাইয়া হেডমাষ্টার মহেশ বাবুকে বলিলেন, "উনি হাঁটিয়া যাইতেছেন—তারক ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে এটা ভাল দেখায় না, তোমরা কেহ হাঁটিয়া তাঁহার সঙ্গে যাও।" রামশঙ্কর বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরিজা শঙ্কর তখন স্কুলে উপস্থিত ছিলেন, পিতার ঐ কথা শুনিয়া "Uncle return, Uncle return" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া তারক বাবুকে ফিরাইলেন। তারক বাবু সকল কথা শুনিয়া ঘোড়া রাখিয়া নিজেই হাঁটিয়া গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে গেলেন এবং সকল দেখাইলেন।

প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার কার্য্য করিয়া কিশোরগঞ্জ হইতে চলিয়া গেলে সেখানে নূতন করিয়া ব্রাহ্মসমাজ গঠন বা তাহার সভ্য সংখ্যার বৃদ্ধি এমন কিছুই হইল না, কিন্তু হিন্দুসমাজ চঞ্চল এবং স্থানে স্থানে নানা আন্দোলনে আলোড়িত হইতে লাগিল। বিজয়-বাবুর বক্তৃতা ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত ময়মনসিংহ নগরে যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল সে সকল সংবাদ ক্রমে কিশোরগঞ্জে পঁহুছিল এবং তার পর সাক্ষাৎকারে তাঁহার বক্তৃতায় যাহা শুনা গেল এবং বিপ্লব ও পরিবর্ত্তনের দিকে যুবকদিগের যেরূপ আকর্ষণ দেখা গেল তাহাতে হিন্দুসমাজকে টলমলায়মান করিয়া তুলিল।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শুনিলেন ময়মনসিংহে হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা হইতেছে; সুতরাং ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তাঁহাদেরও একটা কিছু করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন। কিশোরগঞ্জ নগরে শ্যামসুন্দর বিগ্রহের প্রশস্ত মন্দির ও প্রাঙ্গনযুক্ত একটী সুন্দর আখ্ড়া আছে, চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলের

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দুগণ মিলিয়া আখ্ড়ায় এক সভা করিলেন। গৌরচন্দ্র পাঠক নামে সেখানকার একজন টোলের পণ্ডিত সেক্রেটারী রামশঙ্করবাবুর নিয়োগক্রমে আমাদের স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন এবং ছাত্রদিগকে বাঙ্গলা পড়াইতেন। এই উপলক্ষে স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক প্রভৃতি নূতন সভ্যসমাজের সঙ্গে পাঠক মহাশয়ের মেশামেশি হইত। তিনি জামা গায় দিয়া নাগরা জুতা পায় দিয়া স্কুলে যাইতেন। উল্লিখিত আখ্ড়ার সভাতে উক্ত পাঠক মহাশয়ও গিয়াছিলেন।

জনৈক পণ্ডিত পাঠক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৌরচন্দ্র, বল তো ব্রহ্মজ্ঞানীরা কি বলে?" তিনি উত্তর করিলেন, "তাহারা বলে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে কোন প্রভেদ নাই, সকলেই মানুষ ও এক ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং সকলেই সমান।"

পণ্ডিত—বল কি গৌরচন্দ্র, তাহারা এত বড় কথাই বলে?

পাঠক—আজ্ঞা হাঁ, ওরা আরও অনেক বড় বড় কথা বলে।

পণ্ডিত—না, তা কেন হইবে? ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সেইজন্য ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, আর ব্রহ্মার পাদদেশ হইতে শূদ্রের উদ্ভব তাই শূদ্র নিকৃষ্ট।

পাঠক—তাহারা বলিবে "আমরা এই যুক্তি মানি না।"

পণ্ডিত—কি বলিলে গৌরচন্দ্র? তাহারা এই কথাই বলিবে যে "শাস্ত্র মানি না"?

পাঠক—আজ্ঞা হাঁ; তাহারা এইরূপই বলিবে।

পণ্ডিত—তখন ধরিয়া দিব এই বেদ খানা।

পাঠক—তোমার বেদ মানি না।

পণ্ডিত—আরে ও গৌরচন্দ্র বলিস্ কি? তাহারা কি এই কথাই বলিবে যে "বেদ মানি না?"

পাঠক—হাঁ।

পণ্ডিত—বেদ মান না? তবে মান কি আমার—এই বলিয়া বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক একটা অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিয়া ফেলিলেন।

এই ভাবে তাঁহাদের আপনাদের মধ্যেই নানারূপ বাদানুবাদ হইয়া সভা ভঙ্গ হইল, কিছুই অবধারিত হইল না। প্রাচীনদিগের মধ্যে অনেকেই "রাম রাম, দুর্গা দুর্গা, ঘোর কলি উপস্থিত, আর কিছুই থাকিবে না," ইত্যাদি বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কিশোরগঞ্জ স্কুলের পণ্ডিত ব্রহ্মনাথ বাবু ব্রাহ্মসমাজের একজন সভ্য ছিলেন। তিনি নর্ম্ম্যাল স্কুলের পাশকরা ছাত্র, পড়া শুনা বেশ ভালই ছিল, কিন্তু তাঁহার সাংসারিক সহজবুদ্ধি প্রখর ছিল না। তিনি সুচতুর মহেশ বাবু ও গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে এক বাসায় থাকিতেন—আর তাঁহারা উঁহাকে কত রকমেই নাচাইতেন। একটা মশারী প্রস্তুত হইতেছিল—তাহার চাঁদোয়া লাগান হয় নাই কেবল মাত্র চারি দিকের ঘেরাওটা সেলাই হইয়াছে; তাহা দেখিয়া ব্রহ্মনাথ বাবু বলিলেন "এ কেমনতর মশারী? ছাদ নাই কেন?" মহেশ বাবু বলিলেন "এই এক নূতন ফ্যাসান হইয়াছে।" ব্রহ্মনাথ বাবু —"তা বেশ, হাওয়া খেলবে ভালই কিন্তু উপর হইতে যদি একটা সাপটাপ কিছু পড়ে?" গোবিন্দ বাবু বলিলেন "সাপ কি আর ঘরের চালে উঠিয়া সর্ব্বদাই বসিয়া থাকে?" ব্রহ্মনাথ বাবু বেশ প্রবোধ পাইলেন, কিন্তু ছাত না থাকাতে উহা যে মশারী হইল না একথা তিনি বুঝিলেন না। পরবর্ত্তীকালে এরূপ সহজজ্ঞান শূন্য অনেক লোককে ব্রাহ্মসমাজে সহসা প্রবেশ করিতে দেখিয়াছি। তদ্রূপ লোকের সংখ্যার একটুকু বাড়াবাড়ি দেখিয়া বাহিরের বুদ্ধিমানেরা বলিয়া থাকেন যে "বোকা যাহারা তাহারাই ব্রাহ্ম হয়।"

বোকা ব্রাহ্ম।

গৌরচন্দ্র পাঠকের মাথায় একটা টিকি ছিল। ব্রহ্মনাথ বাবুর খেয়াল চাপিল সেই টিকিটা কাটিয়া ফেলিবেন। তা' যদি আপনার হাতে কাঁচী ধরিয়া হাসি-তামাসাচ্ছলে পাঠকের টিকিটা টানিয়া ধরিতেন ও কাটিয়া ফেলিতেন তাহা হইলে বিশেষ কিছু দোষ হইত না; কিন্তু ব্রহ্মনাথ বাবু তাহা না করিয়া গোপনে মন্ত্রনা করিয়া চারিজন ছাত্রকে ঐ কার্য্যে

নিযুক্ত করিলেন। ছাত্রদিগকে বলিলেন যে "পাঠক যখন ক্লাসে বসিয়া পড়াইতে থাকে তখন তোমরা দুইজন সম্মুখে যাইয়া ব্যাকরণের একটা প্রশ্ন বুঝাইয়া দিতে বলিবে, আর দুইজন পেছন দিক হইতে যাইয়া ক্যাঁচ করিয়া টিকিটা কাটিয়া ফেলিবে।"

নির্ব্বাচিত ছাত্র চতুষ্টয় পণ্ডিত মহাশয়ের উপদেশ ক্রমে তাহাই করিতে চলিল। ইহারা স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র। পাঠক মহাশয় যখন কোন এক নিম্ন শ্রেণীতে পড়াইতেছিলেন তখন দুইজন যাইয়া তাঁহাকে ব্যাকরণের একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল; উনি টোলের পণ্ডিত কিনা,—তাঁহার কাছে ব্যাকরণ শিখিতে ঐরূপ ভাবে ছাত্রগণ উপরের ক্লাস হইতেও যাইয়া থাকে। পিছন দিক হইতে যে দুইটী ছাত্র পাঠক মহাশয়ের চেয়ারের কাছে যাইয়া দাঁড়াইল তন্মধ্যে একজন মুসলমান—নাম অফজ্জল হোসেন,—কাঁচী জোড়া তাহার হাতেই দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে, টিকিতে হাত দিতে সাহস করিতেছে না, এমন সময় সম্মুখের ছাত্রদের দিকে চাহিবামাত্র উহারা হাসিয়া ফেলিল, তখনই পাঠক মহাশয় পিছন দিক ফিরিয়া চাহিলেন আর অমনি সকল কথা বাহির হইয়া পড়িল। ক্রোধে ও দুঃখে পাঠক মহাশয়ের চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া পড়িল। তিনি হেডমাষ্টারের কাছে যাইয়া সকল কথা জানাইলেন, হেডমাষ্টার সেক্রেটারীর নিকট রিপোর্ট পাঠাইলেন। বাবু রামশঙ্কর সেন সেই রিপোর্ট পাইয়া হেড মাষ্টার মহেশ বাবুকে জানাইলেন যে সেই দিন কাছারীর পর স্কুলে যাইয়া ইহার বিচার করিবেন। অভিযুক্ত ছাত্রগণ এবং স্কুলের শিক্ষকগণ সকলকেই যেন উপস্থিত রাখা হয়।

স্কুল ছুটি হইল, কাছারী বর্‌খাস্ত হইল, কত স্থানে কতরূপ বলাবলি হইতে লাগিল। অনেক ছাত্র ছুটি পাইয়াও বাড়ী গেলনা, বিচার ফল

দেখিবার জন্য আশে পাশে রহিয়া গেল। বিচারক ও আসামী উভয়েই ব্রহ্মজ্ঞানী, এক দলের লোক। ফরিয়াদী একজন প্রাচীন সম্প্রদায়ের গোঁড়া হিন্দু, এক্ষেত্রে সুবিচার হইবে না বলিয়া কত লোক কত আশঙ্কা করিল। কঠোর মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া সেক্রেটারী মহাশয় স্কুলে যাইয়া বসিলেন এবং স্থির ধীর ও গম্ভীর ভাবে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই বিষয়ের বিচার করিলেন। ব্রহ্মনাথ বাবু তাঁহার জবাবে বলিলেন—"টিকিটা একটা অসভ্যতার চিহ্ন, তাহা দেখিতে ভাল দেখায় না, তাই সেটা কাটিয়া ফেলার জন্য ছাত্রদের বলিয়া ছিলেন, পাঠককে অপমানিত করা বা তাহার মনে কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল না।" অপরাধী ছাত্রগণ কখনও কোন গবর্ণমেণ্ট স্কুলে পড়িতে বা কোন আপিসে চাকরী করিতে পারিবে না। পণ্ডিত যাহাতে আর কোন স্কুলে কি আপিসে কাজ না পায় তাহার বন্দোবস্ত করা হইবে ইত্যাদি নানাবিধ কঠোর শাস্তিবিধানের প্রস্তাব সেক্রেটারী মহাশয় করিতে লাগিলেন, হেড মাষ্টার মহেশ বাবু তাহাদের পক্ষে অনুনয় বিনয় করিয়া যাহাতে শাস্তির কঠোরতার লাঘব করান যায় তাহার চেষ্টা করিলেন। অপরাধী ছেলেরা ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, কখনও পাঠক ঠাকুরের পায়ে পড়ে কখনও রামশঙ্কর বাবুর পায়ে ধরে, আর হায় হায় করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে। অতঃপর চূড়ান্ত নিস্পত্তি এই হইল যে অপরাধী ছাত্রগণ পাঠক মহাশয়ের পায় ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং এক সপ্তাহ কাল স্কুলে যাইয়া প্রথম ঘণ্টা বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া থাকিবে। ব্রহ্মনাথ বাবু চাকরী হইতে বরখাস্ত হইলেন এবং কিশোরগঞ্জ ছাড়িয়া অন্যত্র যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইতে আদিষ্ট হইলেন। ছাত্রেরা আবার হাউ হাউ করিয়া কাঁদিল এবং পাঠক মহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিল। পাঠক এই বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া ছাত্রদিগকে ক্ষমা করিলেন—সর্ব্ব সাধারণে বিচারকের ভূয়সী প্রশংসা করিল।

বাবু রামশঙ্কর সেনের সুযোগ্য সিরিস্তাদার মুনসী শ্যামসুন্দর রায় মহাশয়ের বাসায় থাকিয়া আমি কিশোরগঞ্জ স্কুলে পড়িতাম। সম্পর্কে তিনি আমার খুল্লতাত হইতেন। পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার এমনি অধিকার ছিল যে তাঁহার পার্সী রচনা দেখিয়া বড় বড় মৌলবী সাহেবেরা স্তম্ভিত হইতেন। সংস্কৃত নৈষধাদি কঠিন গ্রন্থের ব্যাখ্যা তাঁহার মুখে শুনিয়া চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণ চমৎকৃত হইতেন। ইনি প্রাচীন হিন্দু সমাজের লোক হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণ উদার ও হৃদয় অতি প্রশস্ত ছিল। শেষ বয়সে নিজের অধ্যবসায় গুণে ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। সুন্দর লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন এবং উত্তর প্রত্যুত্তরে কিছু কিছু বলিতেও শিখিয়াছিলেন। তিনি আমাদের স্কুলের মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং বাঙ্গলা সাহিত্য ব্যাকরণ পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের পরীক্ষক ছিলেন সেক্রেটারী স্বয়ং রামশঙ্কর বাবু। সিরিস্তাদার মহাশয়ের প্রশ্ন সকল এমনি কঠিন হইয়াছিল যে তাহার উত্তর করা শিক্ষকদের পর্য্যন্ত কষ্টকর বোধ হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে স্কুলে যে সকল আলোচনা ও অভিযোগ হইত তাহা আমি বাসায় যাইয়া তাঁহাকে জানাইতাম, তাহাতে মুন্সী মহাশয় বলিতেন "আমরা ত বাবা এরূপ কান্না কাটির কোন অর্থ বুঝি না। যে গ্রন্থখানা পাঠ করিয়াছি তাহাতে যত কেন কঠিন প্রশ্ন করনা অবশ্যই উত্তর দিতে পারিব, যদি না পারি তবে বুঝিব যে তাহা ভালরূপ অধ্যয়ন করা হয় নাই।" সে কালের শিক্ষা এইরূপই ছিল। ছাত্রদের পরীক্ষার কাগজ দেখিয়া নম্বর দেওয়ার সময় তিনি কিছুমাত্র অনুগ্রহ দেখাইতে চাহিতেন না। আমি কাছে থাকিয়া ছাত্রদিগের পক্ষে তর্ক করিয়া ও প্রশ্নের কাঠিন্য প্রদর্শন করাইয়া কতকটা নম্বর দেওয়াইতাম। আমি একটু ভাল লিখিতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই পরীক্ষক মহাশয়ের

নিকট ঘেঁসিতে সাহস করিয়াছিলাম, নতুবা তাঁহার গর্ব্ব-বিস্ফারিত সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া ভীতচিত্তে দূরে থাকিতে হইত। খুড়া মহাশয় প্রত্যহ স্নানের কালে মহিম্নঃ স্তব ও নবগ্রহ স্তোত্র এমনই বিশুদ্ধ উচ্চারণ-সম্বলিত গম্ভীর স্বরে পাঠ করিতেন যে তাহা অতীব সুললিত হইয়া আমাদের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিত। সে সকল ললিত গাথা এতই শ্রুতি-মধুর যে সম্যক্ অর্থ বোধ না হইলেও তাহা শ্রবণমাত্রই মুখস্থ হইয়া যায়। অন্য শত কাজে বা খেলা কৌতুকে অভিনিবিষ্ট থাকিলেও চিত্ত এইদিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার সন্তানেরা কৃতবিদ্য হইয়া তাঁহার নামের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তাহা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রিন্সিপ্যাল শ্রীমান্ সারদারঞ্জন রায় (আজকাল S. Ray নামে অনেকের নিকট পরিচিত) তাঁহার স্বর্গগত পিতৃদেবের পদানুসরণ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ উপেন্দ্রকিশোর (Artist U. Ray) স্বদেশে ও বিদেশে আপন বুদ্ধিমত্তায় সূক্ষ্ম শিল্পে কিরূপ অধিকার জন্মিয়াছে তাহার পরিচয় দিয়া বংশের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

১৮৭০ সালের—ডিসেম্বর মাসে আমরা প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ঢাকা নগরে গিয়াছিলাম। সে স্থানের উল্লেখ যোগ্য ঘটনা বিশেষ কিছু নাই। একদিন মাত্র পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনাতে গিয়াছিলাম। আর একদিন খৃষ্টানদিগের গির্জ্জাতে গিয়াছিলাম। মন্দিরে কে উপাসনা করিয়াছিলেন বা কে সঙ্গীত গাইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারিব না, কিন্তু "তুমি জ্ঞান, প্রাণ"—সুমধুর সঙ্গীত যে শুনিয়াছিলাম তাহার স্মৃতি অদ্যাপি প্রাণের মধ্যে জাগরিত রহিয়াছে। ঢাকা কলেজের সম্মুখেই যে বড় গির্জ্জা বিদ্যমান আছে আমি তাহাতেই খৃষ্টান-দিগের উপাসনা শুনিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা
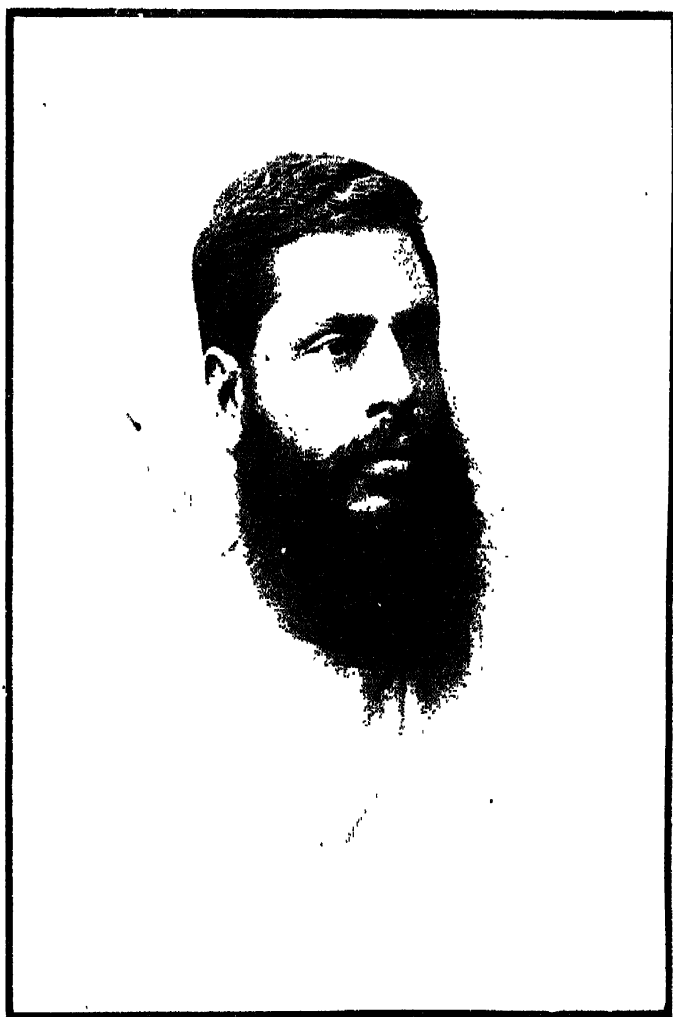
স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (ইউ, রায়)।

ঘটিল না। বারান্দায় যাইয়া দাঁড়াইয়াছি, ঘরে প্রবেশ করিব, এমন সময় একজন সাহেব আসিয়া পাঙ্খাকুলিকে বলিলেন "দেখো, আগর দেখেগা যো সাহেব লোক বৈঠা হ্যায়, তো পাঙ্খা খিঁচো, বাবু লোগ্ বইঠ্‌নেসে মইত্ খিঁচো।" 'পাঙ্খা পূলার' "বহুত খোব্" বলিয়া সাহেবকে বিদায় করিল, কিন্তু আমি আর সেই গির্জ্জাতে প্রবেশ করিলাম না, বা সেই বারান্দাতেও আর দাঁড়াইলাম না। সাহেবের কথাগুলি আমার বুকে বিষম আঘাত করিল, খৃষ্ট ধর্ম্মোপাসকের এইরূপ উদার নীতির পরিচয় পাইয়া বড় ব্যথিত হইলাম এবং নিতান্ত ঘৃণার সহিত সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম বটে কিন্তু কলেজে আর পড়া হইল না। এ পর্য্যন্ত যে আসা গিয়াছিল তাহাই অনেক ঝকাঝকি করিয়া, কারণ ব্রাহ্মসমাজের দিকে ঝোঁক দেখিয়া অগ্রজ মহাশয়, আমি স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে থাকা কালেই, খরচ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। পরীক্ষার পর যখন পড়া বন্ধ হইল তখন ব্রাহ্মসমাজে আরো অধিক যাতায়াত করিতে লাগিলাম। কিন্তু যে অভিভাবক মহাশয়ের বাসায় থাকিতাম তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না; আমাকে তাঁহার বাসা হইতে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

এস্থলে আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ এবং পূজনীয় সেই অভিভাবক মহাশয়ের একটুকু পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য। আমার কিশোরগঞ্জের অভিভাবক পূজ্যপাদ শ্যামসুন্দর মুন্সী মহাশয়ের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, নসিরাবাদের অভিভাবক তাঁহারই অন্যতর ভ্রাতা মুন্সী নবকিশোর রায় মহাশয় সদর আমিনী আদালতের সিরিস্তাদার ছিলেন। সম্পর্কে ইনিও আমার খুল্লতাত হইতেন। তিনি বাঙ্গলা ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিশালী ছিলেন। তাঁহার হাতের লেখা যেমন বিশুদ্ধ ও সুন্দর ছিল চরিত্রও তেমনি নির্ম্মল ছিল।

১৮৭১ সাল—একদিন মধ্যাহ্নে বাসায় আহার করিতে যাইয়া শুনিতে পাইলাম আমার ভাত হয় নাই, বাসা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে খুড়া মহাশয় আদেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারি নাই। আমি হাসিতে হাসিতে বাসা হইতে বাহির হইলাম, খুড়ীমার সঙ্গে দেখা করিলাম না, কারণ তাহা হইলে তিনি কাঁদিবেন এবং আমাকেও কাঁদাইয়া অস্থির করিবেন। বাসা হইতে বাহির হইয়া একদম কালেক্টরী কাছারীর বটতলায় চলিয়া গেলাম। সেখানে আমার পরম সুহৃৎ ব্রাহ্মবন্ধু বাবু শরচ্চন্দ্র রায় তখন ষ্ট্যাম্পের বাট্টাদারী করিতেন। তাঁহাকে অবস্থা জানাইলাম এবং দুজনেই হাসিলাম, আবার গম্ভীরভাবে চিন্তা করিলাম। তিনি জানিতেন আমি ব্রাহ্ম বাসায় যাইব না ; আমার ইচ্ছা কোন হিন্দু বাসায় থাকিয়া ব্রাহ্ম সমাজের সহিত যোগ রাখা। শরৎবাবু আমাকে ছয়টী পয়সা দিলেন আমি তাহা লইয়া গোয়ালার দোকানে যাইয়া দধি চিড়া গুড় লইলাম ও সেখানেই মধ্যাহ্নের কার্য্য শেষ করিলাম। তার পর বিকাল বেলা শরৎবাবু আমার জন্য বাসার চেষ্টায় বাহির হইলেন এবং ফৌজদারীর প্রসিদ্ধ মোক্তার নবীনচন্দ্র বসুর বাসায় আমার থাকার বন্দোবস্ত করিলেন। নবীন বোস একজন প্রতিপত্তিশালী মোক্তার ছিলেন, ঢের টাকা উপার্জ্জন করিতেন কিন্তু ইন্দ্রিয় দোষ ছিল, তাই তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থের অতি অল্পমাত্রই পরিবারস্থ লোকের সাহায্যে প্রেরিত হইত। নবীন বাবুর বাড়ী ছিল ঢাকার নিকটে পারজোয়ারের মধ্যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন অন্ধ, তিনি সময়ে সময়ে নসিরাবাদ যাইয়া ভ্রাতার বাসায় কিছুকাল থাকিয়া যত পারেন টাকা আদায় করিয়া লইয়া বাড়ী পাঠাইতেন। নবীনবাবুর হৃদয় উদার ও প্রশস্ত ছিল এবং স্বভাব নম্র ও বিনীত ছিল।

খুড়া মহাশয় আমাকে তাঁহার বাসা হইতে তাড়াইয়া দিয়া আমার প্রধান ও প্রকৃত অভিভাবক অগ্রজ মহাশয়কে একখানা পত্র লিখিয়া

ছিলেন। সে পত্র পাইয়া দাদা আমার যৎপরোনাস্তি মনোদুঃখিত হইয়াছিলেন এবং সেই পত্রখানা আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিয়া দেখিলাম খুড়ামহাশয় লিখিয়াছেন "ব্রাহ্মসমাজ প্রভুক্তমান শ্রীমান্ কালীকৃষ্ণকে অদ্য হইতে আমার বাসা হইতে স্থানান্তরে যাওয়ার উপদেশ করা গেল। তুমি তাহাকে পত্র লিখিয়া উপদেশ দিয়া দেখিতে পার, কিন্তু যে লৌহশলাকা মলাতে প্রভক্ষিত হইয়াছে তাহা পরিমার্জ্জনা দ্বারা পরিস্কার করিবার চেষ্টা নিষ্ফল বৈ নহে।"

ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুগণ এইপত্র উপলক্ষ্য করিয়া অনেক দিন অনেক আমোদ করিয়াছিলেন। সমাজের অন্যতম সভ্য পুলিস ইনস্পেক্টার শ্রদ্ধেয় প্রসন্নকুমার বসু মহাশয় এই লৌহশালাকার উপমা ও যেরূপ ভাষাতে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছিল তাহা শুনিবার জন্য অনেক দিন আগ্রহ দেখাইয়াছেন।

এই ঘটনার বহুবর্ষ পর বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে আমি নানা স্থান ঘুরিয়া একবার একস্থানে কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে একদিন সন্ধ্যার পর বসিয়া নানা বিষয়ে গল্প করিতেছিলাম, তখন কথা প্রসঙ্গে ঐ পুরাতন কাহিনী আলাপের বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান সবরেজিষ্ট্রার সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমার মুখে সেই লৌহশলাকার গল্পটী শুনিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন "যিনি ঐ চিঠি লিখিয়াছিলেন তিনি অবশ্যই পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিশালী ছিলেন।" আমরা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মৌলবী সাহেব রাগিনী ধরিয়া নিম্ন লিখিত পার্শী বয়াতটী আওড়াইলেন ;—

"আহানে রাকে, মুরিয়ানা বাখোরদ্
না তোঁয়া রাফ্ত আজ্ বাছায়ে কেল জাং"

ইহার বিশুদ্ধ বাঙ্গলা করিলেই হইবে "যে লৌহশলাকা মলাতে প্রভক্ষিত হইয়াছে তাহা পরিমার্জ্জনা দ্বারা পরিষ্কার করা যায় না।"

আমার খুড়া মহাশয় যে পারস্য ভাষায় একজন সুবিজ্ঞ মুন্সী ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহার চিঠি লিখার প্রায় ১৫ বৎসর পর তাহার এই ব্যাখ্যা শুনিতে পাইয়া আমার হৃদয় আহ্লাদে উৎফুল্ল হইল এবং যেরূপ উৎসাহ ও আনন্দের সহিত সেই পত্রের বাক্য মুখস্থ করিয়াছিলাম, সেইরূপ উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে এই পার্সী বয়াতও লিখিয়া লইলাম এবং তাহাও এমনি মুখস্থ হইয়া গেল যে আজও তাহা ভুলিতে পারি নাই।

আত্মকথা।

যখন এণ্ট্র্যান্স পাশ করিলাম তখন ওকালতি পরীক্ষা দেওয়ার কথা হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের যুবক বন্ধুদিগের মুখে সর্ব্বদাই শুনিতাম মিথ্যা প্রবঞ্চনা ব্যতীত ওকালতি ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করা চলে না, সুতরাং ওকালতির উপর বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিল। আর সেজন্য প্রস্তুত হওয়া ঘটিল না। বিষয় কর্ম্মের চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম। আপিসের সময় কাছারিতে যাইয়া চাকরীর উমেদারী করিতাম, তা ছাড়া দিবা রাত্রির অধিকাংশ কালই ব্রাহ্মবন্ধুদিগের সঙ্গে ও ব্রাহ্মসমাজের কাজে কাটাইতাম।

এই সময়ে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি রচনা করিয়াছিলাম ঃ—

(রামপ্রসাদী সুর)

এ বেশে আর ফিরব কত?
মতিচ্ছন্ন পাগলিয়ার মত।
(যেন পথহারা পথিকের মত।)
কোথা যাব কি করিব,
দেখিনা স্থান মনের মত;
এখন কোথায় গেলে থাকব সুখে
ভেবে হলেম বুদ্ধিহত।

ভূতের বেগার খেটে, খেটে,
এ জীবনটা হ'লো গত।
আবার পরকালের নাই কিছু বল,
তাই ভেবে প্রাণ কণ্ঠাগত ॥
ধ্যান ধারণা উপাসনা
ভজন পূজন সাধন যত
তা কোনকালে, এ কপালে
হ'লোনা মোর মনের মত ॥

এই সঙ্গীত দ্বারা আমার তদানিন্তন সাংসারিক ও মানসিক অবস্থার আভাস পাইয়া বন্ধুগণ আমোদ প্রকাশ করিতেন। পরলোকগত বন্ধুবর রমাপ্রসাদ বিষ্ণুর সঙ্গে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীযোগে কলনাদী ব্রহ্মপুত্র তটে উপবিষ্ট হইয়া যখন উচ্চকণ্ঠে এই গীত গাইতাম তখন কতই আনন্দ উপলব্ধি হইত। সে তো গেল তরুণ, চঞ্চল, যৌবনকালের কথা, তখন ভাবের বশে কবিতা মাত্র লিখিয়াছিলাম। এখন জীবনের সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত, এখন যতই চিন্তা করি

"ভূতের বেগার খেটে খেটে
এ জীবনটা হ'লো গত,
আবার পরকালের নাই কিছু বল
তাই ভেবে প্রাণ কণ্ঠাগত ॥

ততই প্রাণ মন ব্যাকুল হয়।

হিন্দু সমাজে হরিসঙ্কীর্ত্তনের একটী গান আছে—"হরির লুট পড়েছে আনন্দের আর সীমা নাই, চাঁদ বদনে হরি বল ভাই," শৈশবকাল হইতে হরির লুটে এই গান শুনিয়াছি, এ গানের এমনি সুর যে মৃদঙ্গ করতালের তালে তালে এই গান শুনিবা মাত্র নৃত্য করিতে ইচ্ছা হয়। ব্রাহ্মসমাজে

এই সুরে গাইবার জন্য আমি সেই সময়ে নিম্নলিখিত কীর্ত্তনটী রচনা করিয়াছিলাম। প্রচারক গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় তখন ময়মনসিংহে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন—

কীর্ত্তন।

দিন বয়ে যায় দয়াল বল ভাই।
দয়াল নাম বিনে আর এ সংসারে কিছু নাই
(তোর) মানব জনম বৃথা গেল
পরকাল কি মনে নাই?
(ও) তোর জীর্ণতরী ভাঙ্গা বৈঠা,
কাণ্ডারী ত কেহ নাই।
(এস) দয়াল নামের বাদাম দিয়ে
ভবার্ণবের পারে যাই॥

নবযুগ।

এই সময়ে বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, জ্ঞানাঙ্কুর ও বান্ধব প্রভৃতি মাসিকপত্রিকা সকল নিত্য নূতন ব্যাপার লইয়া নূতন প্রতিভার পরিচয় দিয়া প্রকাশিত হইত আর শিক্ষিত সমাজে আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত করিত। ব্রাহ্মসমাজে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার গঠিত প্রচারকমণ্ডলী সাহিত্য ও ধর্ম্মজগতের নিত্য নূতন তথ্য সকল প্রচার করিয়া দেশ মাতাইয়াছিলেন। কলিকাতা মহানগরীতে যে সকল আন্দোলন সমুপস্থিত হইত তাহার তরঙ্গাভিঘাতে সুদূর মফঃস্বলবাসী লোকদিগকে বিচলিত করিয়া তুলিত, আমরা সেই তরঙ্গায়িত শ্রোতের মধ্যে বিচরণ করিয়া কত সুখ কত আনন্দ সম্ভোগ করিতাম। অভিনব বলে বলীয়ান হইয়া কত উৎসাহ ও উত্তমের সহিত কাজ কর্ম্ম করিতাম। তখন ময়মনসিংহের ব্রাহ্মদোকান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ধর্ম্মপ্রাণ ও কর্ম্মবীর শরৎচন্দ্র রায়ের কার্য্যক্ষেত্র তখন পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হয় নাই। এ

সময় ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও উপাসকমণ্ডলীর সংখ্যা নিতান্ত কম না হইলেও তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। দুইতিনটী লোক ব্যতীত আর সকলের অবস্থাই ছিল "অন্ত ভক্ষ্য ধনুগু´ণ" সদৃশ। অনেকেরই ধুতি চাদর থাকিলে জামা থাকিত না, জামা থাকিলে তো জুতা মিলিত না, এমন কি সর্ব্বদা সকলের পরিতোষজনক আহারের সংস্থান হইত না। সামগ্রী জুটিলেও ভৃত্যাভাবে আহার্য্য প্রস্তুতের বিষম বিভ্রাট ঘটিত। এই তো অবস্থা, কিন্তু তথাপি ইহাদের উৎসাহ উদ্যম ও আনন্দের পরিসীমা ছিল না। তাঁহাদের প্রফুল্ল মুখচ্ছবি ও কার্য্যতৎপরতা, দেখিয়া তাহাদের চিত্তোন্মাদক সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া, বাহিরের লোক মুগ্ধ হইয়া যাইত,—সমাজের দিকে আকৃষ্ট হইত। ব্রাহ্মদিগের চরিত্রগুণে সাহেবেরা এবং রাজকীয় উচ্চকর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন এবং তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

বাবু অনাথবন্ধু গুহ, বাবু শ্যামাচরণ রায়, বাবু কালীনাথ ধর, বাবু শম্ভুনাথ দত্ত প্রভৃতি কতিপয় যুবক প্রায় একই সময়ে উকীল হইয়া ময়মনসিংহ নগরে আসেন। কলিকাতা ও ঢাকা থাকা কালে ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু যে সময়ে তাঁহারা এখানে আসিলেন সে এক বিপ্লবের যুগ। তাঁহারা দেখিলেন হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজে বিষম বিরোধ। হিন্দুসমাজভুক্ত কাহারো পক্ষে তখন ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করা কিম্বা সে সমাজের কোনও কাজে যোগ দেওয়া সামাজিক ও বৈষয়িক স্বার্থ সম্বন্ধে নিরাপদ নহে। তখন মোক্তারদিগের প্রবল প্রাধান্য ছিল। উকীলদিগের পশার সম্পূর্ণরূপে মোক্তারগণের করায়ত্ত ছিল। কোনও উকীলের প্রতি মোক্তার অপ্রসন্ন থাকিলে তাঁহার আর ওকালতনামা পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। মোক্তার সম্প্রদায় মধ্যে সেকালে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা নিতান্তই অল্প ছিল। কিন্তু জমিদার

সরকারের বেতনভোগী মোক্তারদিগের প্রভুত প্রতিপত্তি ছিল, সুতরাং বাধ্য হইয়া উকীল সম্প্রদায় ইহাদেরই মন যোগাইতে চেষ্টা করিতেন, নচেৎ তাঁহাদের আপন ব্যবসায়ে সুখ্যাতি লাভের প্রত্যাশা ছিল না। তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন মোক্তার প্রায় সকলেই গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, তাঁহারা যুবক উকীলদিগকে রীতিমত শাসাইতেন, কোথাও বা সস্নেহ উপদেশ, বিতরণ করিতেন। প্রথা আছে নববিবাহিতা বধুদিগকে শাশুড়ী ননদী প্রভৃতি আত্মীয়েরা নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া থাকেন। গুরুজনের নাম সকল শুনাইয়া দিয়া বলিয়া থাকেন—এই সকল নাম করিও না। পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে যদি কেহ ক'লহপ্রিয় বা অসচ্চরিত্রা থাকে তবে তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে নিষেধ করিয়া যাহাদের সহিত আলাপ করা উচিত তাঁহাদের পরিচয় দিয়া থাকেন। মোক্তারদিগের হাতে যুবক উকীল-বাবুদের অবস্থা ঠিক নববিবাহিতা বধুদিগের অবস্থার অনুরূপ হইয়াছিল! তাঁহাদিগকে বলা হইত "দেখ হে, অমুক কিন্তু বড় ব্রাহ্ম, তাহার কাছে যাতায়াত করিও না, অমুক যে তোমার কাছে আসে সেটা কিন্তু ভাল নয়,—তাহাকে নিষেধ করিয়া দিও" ইত্যাদি। উকীল বেচারাগণ এই স্বাধীন ব্যবসায় লইয়া আসিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা যে কোথায় কি মূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেন না।

ময়মনসিংহবাসীর আপিসে প্রবেস।

গবর্ণমেন্টের সকল আপিসেই বড় বড় যতগুলি চাকরী আছে সকলই বিদেশী লোকদিগের একচেটিয়া ছিল। ময়মনসিংহের অধিবাসী লোক সে সকল সম্ভ্রান্ত পদে একেবারেই প্রতিষ্ঠিত ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, সে দোষ বিদেশীয় লোকদিগের নহে, দোষ ময়মনসিংহের অধিবাসীদিগের নিজের। এদেশের ভদ্র লোকদিগের প্রায় সকলেরই বাড়ীতে যৎসামান্য অন্নসংস্থানের উপযোগী

ভূমি সম্পত্তি আছে, এই "ফুটার মাটী" দ্বারাই মোটা ভাত মোটা কাপড় চলিয়া যায়, কোন প্রকার কষ্ট হয় না; সুতরাং ছেলেপেলেকে ঘরের বাহিরে পাঠাইয়া বিদ্যা শিক্ষা করান কর্ত্তব্য মনে করেন না। তাহার ফল এই হইয়াছে যে দেশের অধিকাংশ লোক মূর্খ বা অশিক্ষিত রহিয়াছে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে কেহ ডেপুটী বা মুন্‌সেফ হইবার আশা ত করিতেই পারে না, সিরিস্তাদার, পেস্কার বা খাজাঞ্চী প্রভৃতিও হইতে পারে না। কাজে কাজেই বিক্রমপুরের ও অন্যান্য স্থানের কায়স্থ, বৈদ্য ও ব্রাহ্মণেরা আসিয়া ঐ সকল পদ অধিকার করিয়া লইয়াছে। এ দেশের তালুকদারগণ যখন সদরখাজানা দাখিল করিতে বা কোনও মামলা মোকদ্দমা উপলক্ষে জেলায় যাইতেন, তখন তাঁহাদের সেই সহরে থাকিবার স্থান ছিল না। সহরের দক্ষিণ প্রান্তে কতকগুলি মুদীর দোকান ছিল, ভদ্রলোকেরা যাইয়া সেই সকল দোকানে বাসা করিয়া থাকিতেন, আর বেগুনপোড়া ভাত খাইয়া আপিসে যাইয়া সেই বিদেশী আমলাদিগকে ঘুস দিয়া বা খোসামুদ করিয়া আপন আপন কাজ সারিয়া দেশে চলিয়া যাইতেন। অনেক ছাত্রকে এই সকল মুদীর দোকানে বাসা করিয়া থাকিয়া স্কুলে পড়িতে হইত। ক্রমে যখন সভ্যতা ও শিক্ষার আলোক দেশে প্রবেশ করিল, তখন তালুকদার মহাশয়েরা আপন আপন ছেলেপিলেদিগকে কিছু কিছু শিক্ষা দিতে লাগিলেন, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত কিছু মাত্র, সম্পূর্ণরূপে উচ্চ শিক্ষা দিয়া ছেলেকে বড় করিব এরূপ ইচ্ছা ও সৎসাহস অতি অল্প লোকেরই ছিল। অধিকাংশ স্থলে যাই দেখা গেল যে ১০।১২ বা ৩০ টাকা বেতনের একটা মোহরেরী কিম্বা কেরাণীগিরী করিবার উপযুক্ত বিদ্যা হইয়াছে, ব্যস্! অমনি পড়াশুনা বন্ধ হইল, চেষ্টা যোগাড় করিয়া কোন এক আপিসে ঢুকিয়া গেলেন, আর কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বা আশা রহিল না,—ইহাতেই সন্তুষ্ট। অভিভাবকদিগকে আর সহরে আসিয়া

চণ্ডী সিংহের মুদীদোকানে বাসা করিয়া থাকিতে হয় না ; সুতরাং তাঁহারা ইহাতেই সন্তুষ্ট। আমি এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বড় দুঃখিত হইতাম এবং স্বদেশবাসী যুবকদিগের অন্তঃকরণে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিতে চেষ্টা করিতাম, প্রত্যেককে উন্নতীর জন্য চেষ্টা করিতে বলিতাম। এ নিমিত্ত প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে কত বক্তৃতা করিতে হইয়াছে, বিদেশীয় কত বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আপোষ বিবাদ ও বাক্ যুদ্ধ হইয়াছে।

এই সময়ে বাবু শ্যামাচরণ রায় উকীল হইয়া ময়মনসিংহে আসিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ দখল আছে জানিতে পারিয়া স্কুলের ছাত্রগণ দলে দলে তাঁহার বাসায় যাইয়া পাঠ বুঝিয়া লইতে ও সাহিত্য চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিল। অতঃপর আমাদের দেশীয় উমেদার ও স্বল্প সন্তুষ্ট এপ্রেণ্টিস্ বা কেরাণীর দল আপিসে কোন একটা কাজ খালি হইলে তাহা পাইবার জন্য চেষ্টা যত্ন করিতে শিক্ষা করিল। এপ্লিকেশন লিখাইয়া দেওয়ার জন্য তাহারা প্রায়ই আমার নিকট বা শ্যামাচরণ বাবুর নিকট যাইত এবং তাহা নিয়া একটু ছুটা ছুটি ও হাঁটা হাঁটী করিত।

নীলকুঠীর সাহেব

স্কটলণ্ডবাসী কে, এস্, ব্রডী নামক জনৈক (K. S. Brodie) সাহেব এদেশে আসিয়া নীলকরবেশে দেখা দিয়াছিলেন। তিনি ময়মনসিংহের উত্তরে বেগুনবাড়ী, প্যারপুর, নান্দিনা, ভীমগঞ্জ, চন্দ্রা, গুণারীতলা প্রভৃতি স্থানে ব্রহ্মপুত্র তীরে নীলের কুঠী সকল স্থাপন করিয়া নীলের কারবার করিয়াছিলেন ; (J. P. Wise) জে, পি, ওয়াইজ নামে দ্বিতীয় এক সাহেব ময়মনসিংহের দক্ষিণাঞ্চলে যাইয়া বাদিয়া, জাঙ্গালীয়া, দরিনগর, বেতাল প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে বহুস্থানে নীলের কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। ব্রডী সাহেবের কুঠী সকলের মধ্যে বেগুনবাড়ীর কুঠীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কুঠী ছিল। সাহেবের ভাগিনেয় মেঃ William Bruce Manson এই কুঠীতে

থাকিয়া ম্যানেজারী করিতেন, অপর কুটীর সাহেবেরা তাঁহার অধীনে কাজ করিত। Wise সাহেবেরও ভাগিনেয় ডন (Dunne) সাহেব ছিলেন কিন্তু তাঁহাদের প্রতাপশালী ম্যানেজার ছিলেন মেঃ টি, টি, কেলোনাস (T. T. Kallonas)। এই কেলোনাস সাহেবের নামে প্রজাদিগের মধ্যে হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। আমাদের অন্যতম বন্ধু ডাক্তার সারদাকান্ত দাস ব্যঙ্গচ্ছলে বলিতেন ইহার নাম "কালানুজ" অর্থাৎ কৃতান্তের ছোট ভাই! আমাদের শৈশবকালেই নীলের কারবার এদেশ হইতে উঠিয়া যায় সুতরাং তাহার কাণ্ড কারখানা যাহা শুনিয়াছি তাহা কোথাও দেখিতে পাই নাই। আমরা যখন এ সকল দেখিবার, শুনিবার ও চিনিবার উপযুক্ত হইয়াছি তখন এদেশের নীলকর সাহেবগণ নীলের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া জমিদারী শাসন করিতেন। দেশীয় জমিদারগণ তাঁহাদের অশাসিত বিদ্রোহী মহালসকল কুঠিয়ালদের নিকট ইজারা দিতেন, সাহেবেরা সে সকল মহাল শাসন ও তাহার কর্ত্তৃত্ব করিতেন। যে সকল ক্ষুদ্র তালুকদার তাঁহাদের পার্শ্ববর্ত্তী প্রবলতর জমিদারকর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইতেন কিম্বা বিদ্রোহী প্রজাগণ যাঁহাদিগকে ক্ষুদ্র বলিয়া তুচ্ছ করিত ও রীতিমত খাজানাদি আদায় করিত না সেই সকল তালুকদার আপন আপন সম্পত্তি কুঠিয়াল সাহেবের নিকট ইজারা দিয়া অনেক স্থলে কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতেন কিন্তু কোন কোন স্থলে আবার আর এক বিপদ উপস্থিত হইত। অনেকেই একবার কুঠিয়াল সাহেবের হাতে মহাল দিলে আর ছাড়াইয়া আনিতে পারিতেন না।

এক সময়ে কলোনাস সাহেবের এমনই প্রভাব হইয়াছিল যে এ জেলার বড় বড় অনেক জমিদারসরকারেই তাঁহার মাসিক বেতন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল এবং তিনি সেই সকল ষ্টেটের ম্যানেজার বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। ময়মনসিংহ সহরে এক প্রকাণ্ড বাড়ীতে তাঁহার

বাসা ছিল এবং জমিদারদিগের বড় বড় ঘোড়া গাড়ী সকল তাঁহার ব্যবহারার্থ সেখানে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিত। বড় বড় রাজকর্ম্মচারী-দিগকে তিনি নানা প্রকারে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন; তাঁহাদের আহার বিহার ও ক্রীড়া কৌতুকের বন্দোবস্ত তিনি করিতেন সুতরাং তিনি যেসকল জমিদারের ম্যানেজার ছিলেন তাঁহাদের আর কর্ত্তৃপক্ষের বিষদৃষ্টিতে পড়িবার আশঙ্কা থাকিত না। এরূপ হওয়ার একটা কারণ হইয়াছিল। একবার কোন এক জমিদার কলোনাস সাহেবের বিপক্ষাচরণ করিয়া বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। মিঃ আনন্দমোহন বসুকে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়া ময়মনসিংহে আনিয়া কয়েকটা মোকদ্দমা করিয়া তবে তিনি নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। সেই ব্যাপারের পর হইতেই উল্লিখিত ম্যানেজারী প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। পরে ১৮৮২।৮৩ সনে কোন এক জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া মিঃ কলোনাস এক হেঙ্গামা খুনের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়া পড়েন, তাঁহার পক্ষের লোকজনের শাস্তি হয় এবং সে সময়ের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ মিঃ কার্ক উড্ (Kirkwood) সাহেব ইঁহার প্রতিকূলে অতি তীব্র মন্তব্য সকল প্রকাশ করিয়া ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। সেই হইতেই কলোনাস্ সাহেবের পতন।

বেগুনবাড়ী কুঠীর ম্যানেজার মিঃ মেনসন সাহেব কলোনাস্-প্রকৃতি বা আকৃতির লোক ছিলেন না—তিনি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবাপন্ন লোক ছিলেন। অতি ভদ্র ও মিষ্টভাষী ছিলেন, তাঁহার হৃদয় অতি প্রশান্ত ও উদার ছিল, তাঁহার ব্যবহারে সকল লোক মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে অনেক দুঃখী দরিদ্রের অন্নসংস্থানের পন্থা রুদ্ধ হইয়া যায়।

১৮৭৪ সালে উক্ত মেনসন সাহেব কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের ম্যানেজার জেনেরেল হইয়াছিলেন। সাহেব তাঁহার বেগুনবাড়ীর কুঠীতেই

থাকিতেন, মাঝে মাঝে সহরে আসিয়া এই আপিসের কাজ করিতেন। সাধারণতঃ কুঠীয়াল সাহেবদিগকে উচ্চ দরের সিভিলিয়ান সাহেবেরা অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন কিন্তু মেনসন সাহেব বংশ মর্য্যাদাতে সম্ভ্রান্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার সঙ্গে সকলেই মেশা মেশী ও আহারাদি করিতেন। William James Money সাহেব সে সময়ে এখানকার ডিষ্ট্রীক্ট্ জজ্ ছিলেন। তিনি খুব aristocratic লোক ছিলেন। তাঁহার আত্ম-সম্মানবোধ খুব জেয়াদা ছিল এবং অপরকেও ভদ্রলোক বলিয়া জানিলে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। ইঁহার সহিত মেনসন সাহেবের বিশেষ বন্ধুতা ছিল, তিনি সহরে আসিলে ইঁহার কুঠীতেই থাকিতেন। জজকোর্ট ও কালেক্টরীর সিরিস্তাদারগণ জুড়ীশাল গায় দিয়া কাছারীতে যায়, দেখিয়া তিনি গৌরব করিয়া বলিতেন, "হামারা দেওয়ানকা বি জুড়ী শাল হ্যায়।" তাঁহার কুঠীর আমলাগণও যাহাতে গবর্ণমেণ্ট আপিসের আমলাদের সমকক্ষ হইয়া সম্মানের সহিত চলিতে পারে ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল।

কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের আপিসে কেরাণীর কাজ বড় অধিক থাকিত না। যখন যাহা উপস্থিত হইত আমি অল্প সময়েই শেষ করিয়া ফেলিতাম, বেতন ৩০৲ টাকা পাইতাম। দেখিলাম এই কাজের সঙ্গে সঙ্গে আরো কোন কাজ করা যাইতে পারে সুতরাং আমার সাহেবকে বলিয়া মাঝে মাঝে অন্য কাজও করিতাম। জেলা স্কুলের কোন শিক্ষক বিদায়ে গেলে তাঁহার একটিনী করিতাম।

পূর্ব্বে স্কুল সমূহের ইন্স্পেক্টার ও ডেপুটী ইন্স্পেক্টারদিগের অধীনে ও তত্ত্বাবধানেই শিক্ষা বিভাগ ছিল। স্থানীয় কার্য্য নির্ব্বাহার্থে লোক্যাল কমিটী অব্ পাব্লিক ইন্ষ্ট্রাক্সন্ নামে কমিটী ছিল, তাহার মেম্বরগণও ইন্স্পেক্টার সাহেবের উপদেশ ও আদেশ অনুসারেই কাজ করিতেন।

Sir George Campbell বাঙ্গলার লেপটন্যাণ্ট গবর্ণর হইয়া দেশের শাসন বিভাগে নানারূপ পরিবর্ত্তন ও অনেক নূতন চাকরী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতেই ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অনেক বাড়িয়া যায়। ডিষ্ট্রীক্টের শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃত্ব ভারও এখন ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে ন্যস্ত হইল। District Committee of Public Instruction নামে এক কমিটী গঠিত হইল, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার President এবং জেলাস্কুলের হেড মাষ্টার Vice President হইলেন। এই কমিটীর কাজের জন্য একটী কেরাণীর পদ সৃষ্ট হইল এবং আমাকেই সেই পদে নিযুক্ত করা হইল। আমি এই কাজে ৩৫৲ টাকা ও কোর্ট অব ওয়ার্ডের আপিসে ৩০৲ টাকা মাসে মাসে পাইতে লাগিলাম এবং খুব স্ফুর্ত্তির সহিত কাজ করিতে লাগিলাম। চারি পাঁচ মাস এই ভাবে কাজ করার পর একাউণ্টেণ্ট জেনেরাল ও কমিশনার সাহেবের আপিস হইতে শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কৈফিয়ৎ তলব হইল এই বলিয়া যে District Committee of Public Instruction আপিসের ক্লার্কের বেতন ৩০৲ টাকা মঞ্জুর আছে, সে স্থানে ময়মনসিংহের ক্লার্ক কালীকৃষ্ণ ঘোষকে ৩৫৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইতেছে কেন? এবং এপর্য্যন্ত অতিরিক্ত যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা refund করা হইবে না কেন?

তখন H. J. Reynolds সাহেব এ জেলার কালেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি একজন সুলেখক ও সুবিখ্যাত কালেক্টর ছিলেন। নিতান্ত স্থির, ধীর ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক—তাঁহার কলমের জোর এমনি ছিল যে তিনি যাহা লিখিতেন তাহার অন্যথা করিতে কমিশনার কিম্বা বোর্ডের মেম্বরগণও সাহস করিতেন না। এই রেণল্ড সাহেবের রিপোর্ট অনুসারে রেভিনিউ বিভাগে বোর্ডের অনেক সারকুলার রদ

হইয়াছে, আবার অনেক নূতন সারকুলার সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার সুখ্যাতি ও সুনাম শুনিয়া Sir Richard Temple লেফটেনেণ্ট গবর্ণর হইয়াই তাঁহাকে একবারে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইতেই সেক্রেটেরিয়েটে লইয়া যান। তখনকার দিনে এরূপ প্রমোশন সচরাচর হইত না। তারপর তিনি বোর্ডের মেম্বর হইয়া যখন কলিকাতায় ছিলেন তখন তিনি ইউনিভারসিটীর Vice Chancellor হইয়াছিলেন।

আমার বেতন সম্বন্ধে উল্লিখিত কৈফিয়ৎ তলবের চিঠি পাইয়া রেণল্ড্ সাহেব কাগজ পত্র পেশ করিতে আদেশ করিলেন। আমি printed সারকুলার খুঁজিয়া বাহির করিয়া দেখিলাম তাহাতে বেতন ৩০৲ টাকার কথাই লিখা আছে। আমার প্রাণ শুকাইয়া গেল, ভাবিলাম এ টাকা তো ফিরাইয়া দিতে হবেই—পাছে বা চাকরীও যায়! কাগজ তো সাহেবের কাছে পাঠাইয়া দিলাম। তিনি উত্তর লিখিলেন যে "ময়মনসিংহ জেলা অন্যান্য জেলা অপেক্ষা অনেক বড় এবং এখানকার কাজ অধিক ও দায়িত্বপূর্ণ সুতরাং এ জেলার ডিঃ কমিটীর ক্লার্কের বেতন কিছু বেশীই হইবে, তিনি ভ্রমে ৩০৲ টাকা স্থলে ৩৫৲ টাকা বেতন দেন নাই, জানিয়া শুনিয়াই ৩৫৲ টাকা বেতনে একজন উপযুক্ত ক্লার্ক নিযুক্ত করিয়াছেন।" ব্যস্—ইহাতেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেল, ময়মনসিংহের এডুকেশন ক্লার্কের বেতন ৩৫৲ টাকাই রহিয়া গেল।

১৮৭৫।৭৬ সাল—নাটকাভিনয়ের হুজুগ আসিয়া ময়মনসিংহে উপস্থিত হইল। মুক্তাগাছা ও ময়মনসিংহের ভূম্যধিকারী মহোদয়গণের সাহায্যে কতিপয় উকীল ও বড় বড় আমলাগণের উদ্যোগে সহরে প্রকাণ্ড এক নাট্যশালা প্রস্তুত হইল। কলিকাতা হইতে উৎকৃষ্ট ব্যাণ্ডমাষ্টার ও মোসন মাষ্টার আনাইয়া স্থানীয় লোকদিগকে কনসার্ট ও অভিনয় শিক্ষা করান হইল।

ময়মনসিংহে নাট্যাভিনয়।

সে সময়ে এই থিয়েটারের উদ্যোক্তাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি আমাকেও ইহাতে যাইয়া ভুক্ত হইতে বলিয়াছিলেন। তিনি কোন গবর্ণমেণ্ট আপিসের উচ্চকর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে আমি স্কুলে এক শ্রেণীতে পড়িতাম, সে জন্য তাঁহাকে অভিভাবকের ন্যায় মান্য ও শ্রদ্ধা করিতাম, তিনিও আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম "দেখি ইহাতে কিরূপ লোক যোগ দেয়, পরে বিবেচনা করিয়া যাহা হয় করিব।" অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা গেল থিয়েটারে যাহারা প্রবেশ করে তাহাদের অধিকাংশ যুবকই চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে না, এবং স্খলিত চরিত্র যাহারা তাহারাই অধিক আগ্রহ-সহকারে ইহাতে প্রবেশ করে, প্রতিপত্তিও লাভ করে। আমার আর অভিনয়ক্ষেত্রে অবতরণ করা হইল না, কেহ আর তাহা বলিতেও সাহস করিল না। ময়মনসিংহের থিয়েটার উৎকৃষ্ট থিয়েটার হইয়া পড়িল। আশু বাবুর অধীনে সুন্দর এক কন্‌সার্ট পার্টি প্রস্তুত হইল। যশোদল নিবাসী বাবু রামকুমার চৌধুরী কালেক্টরীর মুনসীখানায় মোহরের ছিলেন। বাদ্যযন্ত্র মাত্রেই তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। কলিকাতা হইতে আনীত শিক্ষক যে যন্ত্রে একবার যাহা বাজাইয়া দেখাইয়াছে রামকুমার বাবু তাহা তখনই শিখিয়া অপরকে শিখাইতে পারিয়াছেন।

টুন্‌-টুনীর পত্র।

এই সময়ে ময়মনসিংহের "ভারতমিহির" সাপ্তাহিক পত্রিকা সকলের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কাগজ বলিয়া পরিগণিত ছিল। বাবু অনাথ বন্ধু গুহ সম্পাদকের লেখনীপ্রসূত প্রবন্ধসকল পাঠ করিয়া শিক্ষিত সমাজ বিপুল আনন্দ উপভোগ করিত। 'টুনটুনী' স্বাক্ষরিত প্রেরিত পত্র সকল ভারতমিহিরে প্রকাশিত হইয়া নানা বিষয়ের তীব্র সমালোচনা এবং বিদ্রুপাত্মক ও আমোদজনক রহস্যসকল নাগরিক জনগণের দ্বারে উপস্থিত করিত, তাহাতে কত লোকের মনে কত

ভাবেরই উদয় হইত। প্রতি সপ্তাহের কাগজে 'টুন্‌টুনীর' পত্র বাহির হয় কিনা তাহা দেখিবার জন্য ভারতমিহির বাহির হইলে তাহা পড়িবার জন্য লোক সকল উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া থাকিত। ভারত মিহিরের অধ্যক্ষ বাবু কালীনারায়ণ সান্যালের আপিসের বন্দোবস্ত (discipline) অতি সুদৃঢ় ও সুপরিপক্ক ছিল। কাগজে কোনটা কাহার লিখা তাহা চেষ্টা করিয়াও কাহারো জানিবার যো ছিল না ;—ছিল না বলিয়াই রক্ষা, নতুবা টুন্‌টুনী বেচারার ক্ষুদ্র বিহঙ্গমদেহ কোন্‌কালে কাহার গুলিতে ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া যাইত তাহার ঠিকানা নাই। সে সময়ে আপিসে, ঘরে ঘরে ও গাছতলায়, নদীতে, স্নানের ঘাটে ও হাটে বাজারে লোকমুখে টুনটুনী সম্বন্ধে যে সকল সমালোচনা শোনা যাইত তাহাতে বড় আমোদ বোধ হইত। কেহ টুনটুনীর ব্যাঙ্গোক্তি ও আমোদে আমোদ বোধ করিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য তাহার প্রশংসা করিতেছে, কেহবা দন্তে দন্ত ঘর্ষণ বা অধর দংশন করিয়া বজ্রমুষ্ঠি উত্তোলন পূর্ব্বক টুন্‌টুনীকে পাইলে কিরূপে তাহার মস্তক ও অস্থি চূর্ণ বিচূর্ণ করিবে তাহারই অভিনয় প্রদর্শন করিতেছে। সে সকল দর্শন শ্রবণে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ তাহা ভূক্তভোগী ব্যতীত অপরের বুঝিবার সম্ভাবনা অল্প।

মডেল বি, এ, বি, এল।

"মডেল বি, এ, বি, এল" এই শীর্ষক পত্র দ্বারা যেদিন টুন্‌টুনী, কোন এক প্রতিভাশালী শিক্ষিত যুবকের নৈতিক অধঃপতনের কথা লোকসমাজে প্রকাশ করিয়াছিল সে দিন শিক্ষিত সমাজে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। যে দিন টুন-টুনী "গোবরে পদ্মফুল" নাম দিয়া এক পত্র বাহির করিয়াছিল এবং তদ্দ্বারা জনৈক ক্ষুদ্রচেতা উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সর্ব্বসাধারণের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের কাহিনী প্রচার করিয়াছিল, সে দিন আপিসে খুব আন্দোলন হইয়াছিল, বাহিরের লোক খুব আমোদ ভোগ করিয়াছিল।

সেই স্পর্দ্ধান্বিত কর্ম্মচারী টুন-টুনীর পত্রের শিরোভাগেই তাঁহার বংশ-মর্য্যাদার কথা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে দেখিয়া যদিও সমধিক ক্রোধান্বিত ও বিচলিত হইয়াছিলেন তথাপি কিছুকালের জন্য তাঁহার ব্যবহার যে অনেকটা সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

থিয়েটার সম্বন্ধে টুন্‌-টুনীর অভিমত।

থিয়েটার সম্বন্ধে টুন্‌-টুনী লিখিল "সকনসার্ট নাটকাভিনয় বেশ আমোদ যোগাইতেছে তাহা সত্য কিন্তু ইহাতে ছাত্র-সমাজের বিশেষ অনিষ্ট করিতেছে দেখিয়া দুঃখ হয়। যখন গলিতে গলিতে, চলিতে চলিতে দেখি ছাত্রগণ নাট্যাভিনয় দর্শনে মাতিয়া পড়াশুনার ক্ষতি করিতেছে, যখন শুনি কেহ বলিতেছে 'মালতী, মালতী, মালতী ফুল' কেহ 'মজালি, মজালি মজালি কুল' আবার কেহ "হা ললিত, হা ললিত, ললিত, ললিত" বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, তখন বাস্তবিকই মনে বড় কষ্ট হয়।' এই পত্র বাহির হইলে পর বাবু দেবিদাস সেন ছাত্রগণকে নাট্যশালার প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন ও পরামর্শ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্ম সমাজের শরচ্চন্দ্র রায় ও সিভিলিয়ান সুরেন্দ্র নাথের নবজীবন।

১৮৭৮ সালে—গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতা গিয়াছিলাম। আমার জীবনে কলিকাতা যাওয়া এই প্রথম। ঢাকা হইতে ষ্টীমারে গোয়ালন্দ ও তথা হইতে ট্রেণে কলিকাতা গেলাম। শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শরৎ বাবু এবং ভায়া অমরচন্দ্র দত্ত আমার জন্য প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। কলিকাতার সহরে আর কখনও যাই নাই, মনে আশঙ্কা করিতেছিলাম যে ষ্টেশনে নামিয়া যদি পরিচিত কাহাকেও না পাই তাহা হইলে আমার দশা তো 'স্বর্ণলতার' সেই নীলকমলের ন্যায় হইবে। উপরোক্ত বন্ধুদ্বয়কে প্রাপ্ত হওয়াতে সে আশঙ্কা বিদূরিত হইল, আমি প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাদের সঙ্গে

কালিদাস সিঙ্গীর লেনে ৩৫নং বাটীতে চলিয়া গেলাম। এই শরৎ বাবুকে ইতিপূর্ব্বে একবার ষ্ট্যাম্পভেণ্ডার বা বাট্টাদাররূপে পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, আরো অনেকবার ইঁহার নাম উল্লেখ হইবার সম্ভাবনা আছে সুতরাং এখানে তাঁহার পরিচয়টা বিবৃত করাই সঙ্গত বোধ করিতেছি।

ইঁহার বাড়ী ছিল কুমিল্লা জেলায় সরাইল পরগণার মধ্যে নাছিরনগর গ্রামে। সে দেশে হরিপুরিয়া দাস একটা সম্ভ্রান্ত বংশ, সেই বংশে লক্ষ্মীকান্ত দাসের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ শরৎচন্দ্র ও কণিষ্ঠ কৈলাশ। কৈলাশচন্দ্র কাছাড় জেলায় হালিয়াকান্দী সবডিভিসনের সিরিস্তাদার ছিলেন, হয়তো পেন্সন গ্রহণ করিয়াছেন। শরচ্চন্দ্র তরুণ যৌবনে দরিদ্রবেশে ময়মনসিংহ নগরে যাইয়া বনগ্রামনিবাসী জগমোহন চৌধুরী নামক জনৈক মোক্তারের মোহরের নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন এই কার্য্য করিয়াই দশ টাকা উপার্জ্জন করিবেন ও তদ্বারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি পরিবারবর্গের সাহায্য করিবেন। কিন্তু জগদীশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ, সুতরাং অচিরেই তাঁহাকে হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের সঙ্গে সঙ্গে জগমোহন চৌধুরীর কাজ ও বাসা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে ও ব্রাহ্মদিগের বাসায় প্রবেশ করিলেন। এই বাসায় থাকা কালেই ষ্ট্যাম্পের ভেণ্ডারী করিতেন কিন্তু এখন যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন তিনি আর বাট্টাদার নহেন। একজন বড়দরের মার্চ্চেণ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। এক এক চালানে হাজার হাজার টাকার জিনিষ পত্র কলিকাতা হইতে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মদোকানে নিয়া বিক্রী করিতেন। তিনি শৈশবকালেই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে বিবাহ করিবেন না এবং আজীবন সে সঙ্কল্প অক্ষুন্ন রহিয়াছিল। কণিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করার অনুমতি দিয়া নিজে চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা

নির্ব্বিঘ্নে উদযাপন করিয়া গিয়াছেন। স্কুলের ক্ষুদ্র বালক হইতে হাইকোর্টের উকীল ব্যারিষ্টার ও কলেজের প্রফেসার প্রিন্সিপ্যাল প্রভৃতি বড় বড় লোকের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল। একমাত্র চরিত্রবলে তিনি সর্ব্বসাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। He was a self-made man—তিনি স্কুল কলেজে বা পাঠশালায় পড়েন নাই; ব্যাকরণ কোথাও কোন দিন হাতে লইয়াছিলেন কি না সন্দেহ, কিন্তু তিনি যেমন বিশুদ্ধ বাঙ্গলা লিখিতে ও বলিতে পারিতেন, স্কুল কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকে তেমন পারে না। কেবল মাত্র নিজের অধ্যবসায় দ্বারা তিনি এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। যখন হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মদের বাসায় আশ্রয় লইয়াছিলেন ও ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তখন শরচ্চন্দ্র একাকী নির্জ্জনে বসিয়া রাত্রি ও দিনমানে কেবলই পড়িতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা—তারপর আবার ঘণ্টা এইরূপে অনেক ঘণ্টা চলিয়া যাইত তথাপি তাঁহার পাঠ শেষ হইত না। তিনি পড়িতেন কি? আর কিছুই না, কেবল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ধর্ম্মতত্ত্ব ও ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত নানাবিধ গ্রন্থ। এই সকল শুধু পড়িয়া শেষ করার জন্য তিনি পড়িয়া যাইতেন না, প্রত্যেক প্রবন্ধ, প্রত্যেক উপদেশ বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন। তারপর মাসিক সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্রিকা কি গ্রন্থাদি যখন যাহা প্রকাশিত হইত তাহা তিনি নিয়মিতরূপে পড়িতেন। এইরূপে বিশুদ্ধ বাঙ্গলা লিখিবার ও বলিবার অধিকার জন্মিয়াছিল। স্কুল কলেজের ছাত্র এবং ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগের সংসর্গে সর্ব্বদা অবস্থিতি করার দরুণ, কেবল যে কতকগুলি ইংরেজী শব্দ শিখিয়াছিলেন তাহা নহে, অনেক সময় কঠিন শব্দসংযুক্ত বাক্যের দ্বারা কেহ আপন মনের ভাব ইংরাজীতে প্রকাশ করিলে শরৎ বাবু তাহা বুঝিতে পারিতেন এবং সেই সকল শব্দ নিজে উচ্চারণ

শুদ্ধ রাখিয়া বলিতে পারিতেন। যৌবনের প্রথম উদ্যমেই তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের আশ্রয় লইয়াছিলেন, কুসংসর্গ করিতেন না সুতরাং কদালাপ ও কুচিন্তার উৎপীড়নে উৎপীড়িত হওয়ার আশঙ্কা ছিল না, অশ্লীলতার প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। সতত সৎলোকের সংসর্গ ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং সাধু সজ্জনের উপদেশ মালা আলোচনা ও অনুসরণ করিয়া যে চরিত্র গঠিত হয় তাহা পরকালে আর কখনও স্খলিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

গঠিত-চরিত্র হইবার বহুদিন পর ইদানিং শরৎ বাবু দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের প্রতিও আত্মীয়তা বা অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বিপদ আপদে বা রোগে শোকে তাহাদের যথাসম্ভব সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেন। কিন্তু পূর্ব্বে এরূপভাব ছিল না; তখন দুর্নীতিপরায়ণ বা দুষ্ক্রিয়াশক্ত লোকের নাম শুনিলে হাড়ে চটিয়া যাইতেন এবং ব্যাঘ্রগর্জ্জনে সেই লোকের প্রতি, তাহার কার্য্যের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করিতেন।

কত ছাত্রকে যে শরৎ বাবু আপন কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় স্নেহভাজন মনে করিতেন তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। যেমন ছেলেদের মধ্যে, তেমনি মেয়ে মহলে, তিনি ছিলেন সকলেরই "দাদা মহাশয়"। তিনি আমার যে কি ছিলেন তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিয়া বলিতে আমি অক্ষম। প্রিয়তম সুহৃদ, হৃদয়ের বন্ধু, অকপট মিত্র যাহা কিছু বলি কিছুতেই প্রাণ আমার তৃপ্ত হয় না, ঠিক কথাটা যেন বলা হয় না। তাঁহার সহিত বিশ্রম্ভালাপে কত রাত্রি যে জাগিয়া ভোর করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। ব্রাহ্মসমাজের কাহারো প্রতিকূলে কিছু বলিতে হইলে কোন ব্রাহ্মের কাছে বলিবার যো নাই, কারণ তিনি চটিয়া উঠেন। হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে হিন্দুর কাছে কিছু বলিলে তিনি যে খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়ান তাহা তো সর্ব্বদাই দেখিয়াছি; কিন্তু শরৎ বাবুর কাছে সকল

কথাই অকুতোভয়ে বলা যাইত। বিধাতার নির্ব্বন্ধে আমার বিবাহ ব্যাপারটা যাইয়া পড়িয়াছিল শরৎ বাবুর পৈত্রিক বাসস্থান সেই নাছিরনগর গ্রামে। বিবাহের পর দেখা গেল তাঁহার সহিত আমার এক নূতন সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে, তিনি হইতেছেন শ্বশুর এবং আমি তাঁহার জামাতা! কি বিষম ব্যাপার! কিন্তু দেখা গেল ভ্রাতৃপ্রেমের সুদৃঢ় ভিত্তিতে যে সম্পর্ক সংস্থাপিত হইয়াছে তাহাকে স্থানচ্যুত করিয়া আপন অধিকার বিস্তার করিতে পারে এ নূতন সম্পর্কের সেরূপ শক্তি নাই। সুতরাং আমরা পরস্পর যাহা ছিলাম তাহাই রহিয়া গেলাম, কেবলমাত্র বাহিরের সম্বোধনটাতে একটুকু পরিবর্ত্তন করিয়া 'ভায়া' স্থলে 'বাবাজী' ঢুকাইয়া দেওয়া গেল। মধ্যপাড়া নিবাসী প্রিয়দর্শন ছাত্র গগনচন্দ্র দাস, কলেজ ষ্ট্রীটে ২৮নং একটা বাড়ীতে থাকিয়া কলেজে পড়িত। শরৎ বাবু তাহাকে দেখিতে, তাহার সংবাদ লইতে, তাহার সঙ্গে কত কিছু পরামর্শ ও কল্পনা জল্পনা করিতে বার বার সেই বাড়ীতে যাইতেন, সেজন্য শরৎ বাবুর বন্ধুগণ ও অপর ছাত্রগণমধ্যে অনেকে তাঁহাকে পরিহাস করিত। একবার কলেজ বন্ধ হইলে গগনচন্দ্র ময়মনসিংহ আসিয়াছিল, তখন তাহাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে সে হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "কি আর বলিব, সকলে মিলিয়া 28 (টুয়েন্টি এইট) বাক্যটাকে verb (ক্রিয়াপদ) করিয়া ফেলিয়াছে।" "অর্থাৎ এখন কেহ কাহাকে ভালবাসে বলিতে হইলে বলে—টুয়েন্টিএইট করে।" "আর টুয়েন্টিএইটের কাজ নাই" মানে আর ভালবাসার কাজ নাই। এ সম্বন্ধে শরৎ বাবুর কোন এক বন্ধু তাঁহাকে নিম্নলিখিত কবিতাটি উপহার দিয়াছিলেন।—

টুয়েন্টি এইট—

শ্রীমান গগনচন্দ্র পদবীতে দাস।
আসল টুয়েন্টিএইট—অথবা আটাশ॥

বৈকুণ্ঠ, তারিণী, শশি, শ্রীনবকুমার।
আছেগো টুয়েন্টিএইট অনেক তোমার॥
দ্বিতীয় গগনচন্দ্র হোম আখ্যা তার।
বিষম 'আটাশে' ছেলে ছেলের সর্দ্দার॥
সুন্দরীমোহন আর শ্রীমান বিপিন।
উপেন্দ্রকিশোর তথা স্নেহের জ্যোতিন্॥
অমর অমরচন্দ্র হৃদয়ে তোমার।
চৌধুরী শরৎচন্দ্র আর চাকৃলাদার॥
আরো কি পুরান কথা তুলিব তোমার।
দেখাব 'টুয়েন্টি' সহ 'এইট' কতবার॥
তুলিব কি সেই তব সান্যালের কথা।
শ্রীমধুসূদন সেন হাতে খড়ী যথা।
নহে তো টুয়েন্টি এইট তার (ই) কাছে কাছে।
গরীব জামাতা এক আছে কিনা আছে॥
বিগত বৎসর কুড়ী সঙ্গেই তোমার।
দেখিল, লিখিল এই তালিকা এবার॥

কলিকাতা যাইয়া মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে গেলাম এবং প্রচারক ত্রৈলোক্য বাবুর একদিন সঙ্গীত ও আচার্য্য সেন মহাশয়ের উপাসনা ও সার্‌মন্ শুনিলাম। যোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে যাইয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা ও সঙ্গীত শুনিয়াছিলাম এবং রবীন্দ্রনাথকেও দেখিয়াছিলাম—তখন তিনি বালক মাত্র। কেশব বাবুর একটা ইংরেজী বক্তৃতা শুনিবার জন্য বড়ই আকাঙ্ক্ষা ছিল কিন্তু সে সাধ আর মিটিল না।

সে সময়ে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সবেমাত্র সিভিল সারভিস হইতে বরখাস্ত হইয়া স্বাধীন জীবনে পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রথম বক্তৃতা England's duty towards India প্রকাশিত হইয়াছে এবং তিনি Indian Association স্থাপন করিয়াছেন। বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ও বাবু কালীশঙ্কর সুকুলের সমভিব্যাহারে সুরেন্দ্র বাবুর তালতলার বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম এবং দেশের উন্নতি-কল্পে আমরা কি করিতে পারি সে সম্বন্ধে তাঁহার নিকট হইতে অনেক উপদেশ লইয়াছিলাম। সুরেন্দ্র বাবু আমাদিগকে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক বাবু কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন এবং ভারতমিহিরের Representative বলিয়া আমাদের পরিচয় দিয়াছিলেন। তখন সাপ্তাহিক পত্রিকা সকলের মধ্যে ময়মনসিংহ হইতে বাবু কালীনারায়ণ সান্যাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'ভারতমিহির' লব্ধ প্রতিষ্ঠ পত্রিকা বলিয়া পরিগণিত ছিল। বাবু কৃষ্ণদাস আমাদিগকে মুরব্বিআনা দুই চার কথা বলিয়া সংক্ষেপেই বিদায় দিয়াছিলেন কিন্তু সুরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে আমরা ক্রমাগত কয়েকদিন যাতায়াত করিয়া ছিলাম এবং তাঁহার উদার ও অমায়িক ব্যবহারে নিতান্ত আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। তিনি তখনই বলিয়াছিলেন যে দেশের জন্য আমরা যাহা কিছু করিব তাহা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরোধী হইবে না। ভারত সাম্রাজ্য শাসন করা অতি কঠিন ও সমস্যাপূর্ণ ব্যাপার, সুতরাং গবর্ণ-মেণ্টকে আমাদের সাহায্য করা কর্ত্তব্য এবং গবর্ণমেণ্টেরও উচিত যে আমাদের সাহায্য গ্রহণ করেন। সুরেন্দ্র বাবু আমাদের বাঙ্গাল দেশের লোকদিগকে এবং ব্রাহ্মসমাজের যুবকদিগকে খুব কাজের লোক বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। প্রাচীন সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল লোকেরা যে উন্নতির বা সংস্কারের কাজ মাত্রেই বিঘ্ন বাধা উপস্থিত করিয়া থাকেন

তাহা দেখিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "আর ২০ বৎসর পরে দেখিবেন এমন এক দল লোক আসিবে যাহারা আমাদিগকে old fools বলিয়া পেছনে ফেলিয়া চলিয়া যাইবে, তাহাদের সঙ্গে যোগ রাখিয়া চলা আমাদের পক্ষে কঠিন হইবে।" বাস্তবিকই তাহার ২০।২৫ বৎসর পরে দেখিলাম সুরেন্দ্র বাবুর সেই ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

১৮৭৮ সালে সুরেন্দ্র বাবুর উপদেশক্রমে ময়মনসিংহ নগরে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এক শাখাসভা স্থাপন করা হয় এবং তাহার নাম রাখা হয় ময়মনসিংহ সভা। বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর প্রযত্নে ময়মনসিংহ সহরে একটী মাইনার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। শরৎ বাবু কতক দিন সহরের নানা স্থানে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বা কাহারো অনুগ্রহদত্ত বাড়ীতে স্কুলের কাজ করিয়া শেষে জেলা স্কুলের নিকটে এক বাঙ্গালা উঠাইয়াছিলেন। সেই স্কুল ঘরে ময়মনসিংহ সভার প্রথম অধিবেশন হয়। স্থানীয় বারের সুযোগ্য উকীল বাবু ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল্ মহোদয়কে সে অধিবেশনে সভাপতির আসনে বরণ করিয়া সভার কার্য্যপ্রণালী এবং কার্য্যকারক নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল। ইহাই ময়মনসিংহের প্রথম পলিটিকেল পাব্লিক্ এসোসিয়েশন্। ইহার পূর্ব্বে সহর সেরপুরের সুবিজ্ঞ জমিদার বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁহার নিজ বাটীতে ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এক শাখা সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা পলিটিকেল এসোসিয়েসন হইলেও পাবলিক এসোসিয়েশন ছিল না। ময়মনসিংহ এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী পদে আমাকেই নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং ১৮৮০ সালে পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করিয়া মফঃস্বলে চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি সেই সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলাম। পরে বাবু অনাথবন্ধু গুহ উকীলকে ময়মনসিংহ সভার চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া আমি জামালপুরে চলিয়া যাই।

ময়মনসিংহ এসোসিয়েসান্ ও ছাত্রসভা।

Students association নামে ছাত্র সভাও এই সময়েই স্থাপন করা হয়। সেই মনোরঞ্জিকা ক্লাব উঠিয়া যাওয়ার পর হইতে ছাত্রদিগের

সাধারণ সম্মিলনের আর কোন স্থান ছিল না। এবার ছাত্র সভা খুব সুন্দর ও জাঁকাল রকম হইল। ছাত্রও জুটিয়াছিল কতকগুলি উৎকৃষ্ট লোক, তাই তাহাদিগকে লইয়া মনের মত কাজ করিতে পারিয়াছিলাম। তাহারা তাহাদের সভার স্থায়ী সভাপতির পদে আমাকেই নিযুক্ত করিয়াছিল, আমিও আহ্লাদের সহিত তাহাদের কার্য্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। আপিসের চাকরীর কাজ সারিয়া অবকাশ পাইলেই ইহাদের জন্য চিন্তা করিতাম; ইহাদের মঙ্গল কামনায়, ইহাদের উন্নতি কল্পে, ইহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য, ইহাদের অন্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিবার জন্য সমগ্র শক্তি ও চেষ্টা বিনিয়োগ করিতাম। শ্রীমান গগনচন্দ্র দাস, শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্ত্তী, শ্রীমান্ তারিণীচরণ নন্দী, শ্রীমান্ উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, শ্রীমান্ গগনচন্দ্র হোম, শ্রীমান্ নবকুমার সমাদ্দার, শ্রীমান্ মহেশ্বর চক্রবর্ত্তী, শ্রীমান্ হরেন্দ্রচন্দ্র তালুকদার, শ্রীমান বৈকুণ্ঠনাথ সোম প্রভৃতি ছাত্রগণ এই ছাত্রসভার অগ্রণী ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই যেমন পড়া শুনাতে উৎকৃষ্ট ছাত্র, তেমনই বাহিরের কাজে উৎসাহ উদ্যমের জ্বলন্ত মূর্ত্তি এবং কর্ত্তব্য পালনে কঠোর নীতিপরায়ণ ছিলেন। যে কোন সৎকাজের অনুষ্ঠান করা গিয়াছে তাহাতেই এই সকল যুবক প্রাণ মন দিয়া খাটিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে যেরূপ প্রীতির বন্ধন ও ভ্রাতৃভাবের সম্মিলন দেখিয়াছি সেরূপ যথা-তথা দেখিতে পাওয়া যায় না। ছাত্র সভায় মাঝে মাঝে উৎসব করা যাইত, তাহাতে সহরের গন্য মান্য শিক্ষিত লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইত। তাঁহারা ছাত্রগণের পঠিত রচনা শ্রবণ করিয়া, এবং রায়েন্‌জী ও আলেক্‌জাণ্ডার প্রভৃতির অভিনয় করিতে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। এই সকল যুবকের সংসর্গে থাকিয়া তাহাদিগকে লইয়া নিত্য নূতন কাজ করিয়া কত যে বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ করিয়াছি,

কত আনন্দ আহ্লাদে যে কাল কাটাইয়াছি, তাহা আজ জীবনের এই শেষ ভাগে স্মরণ করিয়াও সুখ বোধ হয়। সেবাব্রতে ইহারা সর্ব্বদা অগ্রণী ছিল। সহরে কোথাও কোন রোগীর সংবাদ পাইলে তাহারা দলবলে যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইত এবং রাত্রি জাগিয়া ও দিনে খাটিয়া সুশ্রূষা চিকিৎসা দ্বারা রোগীকে সুস্থ করিয়া তুলিত। এস্থলে বাবু শরচ্চন্দ্র রায়ের নাম পুনঃ উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না।

সেই ধর্ম্মপ্রাণ কর্ম্মবীর শরচ্চন্দ্র সকল কাজে আমাদের সহযোগী ছিলেন। তিনি এই ছাত্রগণের যে শুধু পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাদের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু একাধারে সকলই ছিলেন। ইহারা তাঁহার কাছে সকল প্রকার আব্দারই করিত, তিনিও যথাসম্ভব তাহাদের মন যোগাইতে চেষ্টা করিতেন। ইহাদের কল্যাণ কামনায় শারীরিক পরিশ্রম, মানসিক চিন্তা এবং কত অর্থ ব্যয় করিতেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সকল কাজ করিতাম এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অদম্য উৎসাহ উদ্যমে এক এক কাজে মাতিয়া যাইতাম। তিনি তাঁহার এ জীবনের কাজ শেষ করিয়া স্বর্গ রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অন্তিম কালে তাঁহার সমধর্ম্মী ও সহকর্ম্মী বন্ধুগণ মনের আনন্দে তাঁহার সেবা সুশ্রূষা ও চিকিৎসা করিয়া এবং পরিচর্য্যার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম ব্রহ্মনাম শুনাইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন। উল্লিখিত ছাত্রগণ সংসারে প্রবেশ করিয়া আপন আপন চরিত্র বলে নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিপত্তিশালী হইতে শরৎ বাবু দেখিয়া গিয়াছেন, অথচ বৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্ত্তী ও হরেন্দ্রচন্দ্র তালুকদারকে অসময়ে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দেখেন নাই। কেবলমাত্র গগনচন্দ্র দাসের অকালমৃত্যুজনিত শোক তিনি পাইয়াছিলেন।

শরৎ বাবুর বাড়ী ছিল কুমিল্লা জেলায় কিন্তু তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল এবং জীবনের বিশেষ মূল্যবান অংশ কাটাইয়াছেন ময়মনসিংহে। তিনি ময়মনসিংহকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ঢাকা, বিক্রমপুর, বরিশাল ও কলিকাতা প্রভৃতি বহুস্থানের বহুলোকের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তিনি নানাবিধ সৎকাজে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাছে "বসুধৈব কুটুম্বকম্" হইলেও ময়মনসিংহের প্রতি ভালবাসা অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। সে স্থানের অনেক সৎকাজের সঙ্গেই তাঁহার সংস্রব ও সম্বন্ধ ছিল। তিনি সহরের শ্রমজীবিদিগকে লিখা পড়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটা নাইটস্কুল খুলিয়া ছিলেন এবং তাহাতে বাজারের মুদি দোকানদার প্রভৃতি কতিপয় লোককে লিখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। বাবু শরৎচন্দ্র চৌধুরীর বিশেষ প্রযত্নে ময়মনসিংহ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় সেই কাজে প্রথমাবধি বাবু শরচ্চন্দ্র রায় উক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর প্রধান সহায় ও সহযোগী ছিলেন। ইঁহারা সকলের বাড়ী বাড়ী যাইয়া বালিকা সংগ্রহ করিতেন এবং তাহাদিগকে স্কুলে নিয়া পড়াইয়া আবার বাড়ী রাখিয়া আসিতেন। ইঁহারা ক্রমে ক্রমে অনেক বড় লোকের সাহায্য গ্রহন করিয়া স্কুলকে উন্নত করিয়া তুলিলেন। জেলার মাজিষ্ট্রেট মিঃ আলেকজাণ্ডার সাহেবকে এই স্কুলের পেট্রন করিয়া তাহার নামকরণ হইল আলেকজাণ্ডার গের্‌ল্ স্কুল। কালে মুক্তাগাছার দানশীলা ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতী বিদ্যাময়ী দেব্যা এই স্কুলের সম্পূর্ণ ভার গ্রহন করিয়া ইহার উন্নতি কল্পে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তদবধি ইহা "বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়" নামে অভিহিত হুইয়াছে। এখন এই বিদ্যালয় হইতে মেট্রিকিউলেসান পরীক্ষা দিয়া ছাত্রী সকল উত্তীর্ণ হইতেছে। ইহার শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণের বাসের জন্য সুন্দর বোর্ডিং (ছাত্র নিবাস) প্রস্তুত হইয়াছে। বাবু শরচ্চন্দ্র

চৌধুরী ও শরচ্চন্দ্র রায় এই বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ময়মনসিংহ বাসীর বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

নবকুমার সমদ্দার প্রভৃতি কয়েকটী যুবক কলেজের পড়া শেষ করিয়া আসিলে পর তাহাদের শ্রদ্ধেয় দাদা মশা'য় সেই শরচ্চন্দ্র রায় তাহাদিগকে শিক্ষকরূপে লইয়া এক স্কুল স্থাপন করিলেন এবং তাহার নাম রাখিলেন ময়মনসিং ইনষ্টিটিউসান। বাবু অন্নদাপ্রসাদ দাস ফৌজদারীর হেডক্লার্কও সেরেস্তাদার ছিলেন; তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল; তাঁহাকে এই স্কুলের সেক্রেটারী করিয়া আরো কোন কোন লোকের সাহায্য লইয়া স্কুল চলিতে লাগিল, কিন্তু অচিরেই জেলা স্কুল অলীক ভয়ে ভীত হইয়া প্রতিদ্বন্দীর ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইল; আবার নসিবাবাদ স্কুল নামে আর এক তৃতীয় বিদ্যালয় "ইনষ্টিটিউশানের" প্রতিযোগী হইয়া শরৎ বাবু ও তাঁহার নূতন গঠিত শিক্ষকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিল। ইনষ্টিটিউসানের অধিনায়কগণ অনন্যোপায় হইয়া স্বনামধন্য মিঃ আনন্দ মোহন বসু মহাশয়ের স্মরণাপন্ন হইলেন। তিনি ইহার সম্পূর্ণ ভার গ্রহন করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলিকাতাস্থ সিটী কলেজের অধীনে এক শাখা স্কুলরূপে ইহাকে রক্ষা করিলেন; সেই হইতে ইহার নাম হইল Mymensingh branch of the City Collegiate school। এই স্কুলকে পরে কলেজে উন্নীত করা হইয়াছে এবং তাহা আনন্দ মোহন কলেজ নামে অভিহিত হইয়াছে, শরৎ বাবু তাহা দেখিয়া গিয়াছেন।

শরৎ বাবুর আর এক কীর্ত্তি ময়মনসিংহের "ব্রাহ্মদোকান"। শরৎ বাবু ব্রাহ্ম, তিনি দোকান করিয়াছেন তাই ইহার নাম হইল ব্রাহ্ম দোকান। সেকালে কোন ভদ্রসন্তান ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসায় করিতে অগ্রসর হইত না, বিক্রয়টা নিতান্ত ঘৃণিত ও অপমানজনক বলিয়া সকলে মনে করিত। শরৎ বাবুই প্রথমে এই

ব্রাহ্ম দোকান।

কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এমন কি এই দোকানের মূলধনের টাকা কয়েকজন ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মভাবাপন্ন ব্যক্তি হইতেই সংগ্রহ করিয়া দোকানের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল। হিন্দু সমাজের ২।১ ব্যক্তিও লাভের প্রত্যাশায় ইহাতে কিছু কিছু টাকা দিয়াছেন কিন্তু তাহা অতি সঙ্গোপনে। বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরীও সাহস করিয়া শরৎ রায়ের সঙ্গে যোগ দিয়া দোকানদারী করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং দোকানের নাম রাখা হইয়াছিল রায় চৌধুরী এণ্ড কোং। কিছুকাল পর্য্যন্ত কলিকাতা হইতে ষ্টেসনারী ফার্ণিচার জামা মোজা ইত্যাদি নানাবিধ জিনিষ আনিয়া বিক্রী করা হইল। তার পর ইহাদের হঠাৎ এক খেয়াল চাপিল যে জুতার চালান আনিয়া তাহা এই দোকানে বিক্রী করিতে হইবে। হিন্দু সমাজের শরৎ চৌধুরী আর ইহাতে থাকিতে পারিলেন না, তিনি স'রয়া পড়িলেন এবং হিন্দু সেয়ার হোল্ডারগণ তাঁহাদের অংশের মূলধনের টাকা উঠাইয়া নিলেন। জুতার ব্যবসায় সুবিধাজনক বোধ না হওয়াতে তাহা অবিলম্বেই ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। কিশোরগঞ্জ কাতিয়ারচড় নিবাসী ভগবানচন্দ্র নাথ এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়া শরৎ বাবুর এই দোকানে ঢুকিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইল ভগবানচন্দ্র সরকার এবং দোকানের নাম হইল "রায় সরকার এণ্ড কোং"। দোকানের আসল নাম কিন্তু পড়িয়া গিয়াছে "ব্রাহ্ম দোকান"। সাধারণ লোকদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্ম দোকানের শরৎ বাবু বলিয়া শুনিলেই বুঝিত লোকটা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র আবার শরৎ বাবুর ব্রাহ্ম দোকান বলিয়া সেই দোকানের প্রতিও বহু লোকের বিশেষ ভালবাসা ছিল। শরৎ বাবুর এক একবার কলিকাতা হইতে জিনিষের চালান লইয়া নৌকা পথে ময়মনসিংহ পহুঁছিতে মাসেক কাল চলিয়া যাইত, সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া আশায় পথ পানে চাহিয়া থাকিত। যখন চালান ব্রাহ্ম দোকানের

ঘাটে যাইয়া পহুঁছিত এবং নৌকা হইতে নানা প্রকারের সুন্দর সুন্দর ও মূল্যবান জিনিষ গুলি দোকানে উঠাইয়া সাজান হইত তখন সেখানে ছাত্র মাষ্টার হাকিম আমলা উকিল ও তালুকদার জমিদার প্রভৃতি বহু লোকের সমাগম হইত, এমন কি সাহেবেরা পর্য্যন্ত এই দোকান হইতে জিনিষ কিনিতে যাইতেন। শরৎ বাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ঐ দোকানের অনুকরণে আরো অনেক ভদ্র লোক ক্রমে ক্রমে নূতন নূতন দোকান খুলিতে লাগিলেন। বাজারে যখন এইরূপে বহু দোকান হইল এবং রেল ও ষ্টীমার যোগে জিনিষ পত্র কলিকাতা হইতে নেওয়া সকলেরই সহজ হইল তখন শরৎ বাবু তাঁহার এ ব্রত উদ্‌যাপন হইয়াছে বলিয়া দোকান ছাড়িয়া দিলেন।

হাইকোর্টের উকিল ব্যারিষ্টার হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুলের ছাত্র এবং পথের কাঙ্গাল পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই শরৎ বাবুর বন্ধুতা ছিল, কিন্তু কাহাকে কোন নীতি-বিগর্হিত কাজে লিপ্ত হইতে দেখিলে তখনই তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ব্যারিষ্টার আনন্দ মোহন বসু মহাশয়ের সহিত তাঁহার যেরূপ বিশেষ আত্মীয়তা ছিল, উকিল বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের সঙ্গেও ঠিক সেইরূপ ভাব ছিল, কিন্তু দুর্গামোহন বাবু শেষকালে যে একটা বিবাহ করিয়াছিলেন সেটা শরৎ বাবুর এবং দাস মহাশয়ের আরো অনেক আত্মীয়ের মতের বিরুদ্ধ ছিল। দুর্গামোহন বাবু যেমন স্বমতপ্রধান, নির্ভিক লোক ছিলেন, অন্য কাহারো মতামতের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া আপন ইচ্ছায় বিবাহ করিলেন, শরৎ বাবুও তেমনি নির্ভিক ও সৎ সাহসী লোক ছিলেন; আপন বিবেক বুদ্ধির অনুশাসন সর্ব্বদা অপ্রতিহত রাখিতে কাহারো অনুরোধে কোথাও কিছুমাত্র শিথিলতা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; সুতরাং ঐ বিবাহের পর আর ইঁহাদের মধ্যে পূর্ব্ববৎ বন্ধুতা দূরে থাকুক কোনরূপ সম্বন্ধই রহিল

না, এক বারে দেখা সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ বন্ধ হইল। এই বিচ্ছেদই মরণ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। যখন বাবু দুর্গামোহন দাসের মৃত্যু হয় তখন শরৎ বাবু কলিকাতায় ছিলেন। দেখা গেল সঞ্জীবনী পত্রিকায় দাস মহাশয়ের ছবি সহ জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশ করার জন্য পত্রিকার কার্য্যকারকগণ ব্যস্ত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহারা দুর্গামোহন বাবুর ফটো বা তাহার ব্লক পাইতেছেন না। অতঃপর তাঁহারা শরৎ বাবুর শরণাপন্ন হইলেন। শরৎ বাবু নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "সে কি কথা? দুর্গামোহন দাসের ছবি অবশ্যই বাহির করিতে হইবে।" তিনি তাহার চেষ্টায় সহরে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং ছবি প্রকাশের সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

তিনি নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষকালে তাঁহার জন্মভূমি-সদৃশ প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্র ময়মনসিংহে যাইয়া শেষ শয্যা পাতিয়া ছিলেন এবং সেখান হইতেই পরলোকে যাত্রা করিয়া ছিলেন। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য, শরৎ বাবুর প্রিয় বন্ধু ও সুহৃদ বাবু শ্রীনাথ চন্দ যখন দেখিলেন শরৎ বাবুর আসন্নকাল সমুপস্থিত তখন তাঁহাকে আপন বাড়ীতে নিয়া সবান্ধবে যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব সেবা সুশ্রূষা ও পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। তখন শরৎ বাবুর স্নেহের পাত্র এবং তাঁহাতে স্নেহশীল ও শ্রদ্ধাযুক্ত ছোট বড় বহু লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য শ্রীনাথ বাবুর বাসায় যাইত। শরৎ বাবু যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত তখন তাঁহার বন্ধুদিগের প্রতি মুমূর্ষু বাক্য এই হইল যে "তোমরা অসত্যের সহিত কখনও কম্প্রমাইজ্ (Compromise) করিওনা।" আহা হা, সত্যনিষ্ঠ সাধু জনের মৃত্যুর প্রাক্কালেও কেমন হৃদয়ের বল, কেমন উজ্জ্বল তাঁহার বিবেক, কত প্রশান্ত তাঁহার চিত্ত!

সাহিত্য সম্রাট মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বসন্ত পঞ্চমী উপলক্ষে তাঁহার সমসাময়িক বন্ধু বর্গকে লইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক সুখ সম্মিলন

করিয়াছিলেন এবং অমর কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সম্মিলনকে কলেজ-রি-ইউনিয়ন নামে অভিহিত করিয়া এক উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া তাহাতে পাঠ করিয়াছিলেন।

সারস্বত সমিতি।

আমরা বঙ্গদর্শনে তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়া ছিলাম। শিক্ষিত সমাজকে এক স্থানে আহ্বান করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ করিবার এই এক নূতন পন্থা দেখিতে পাইয়া আমাদের ময়মনসিংহ নগরেও তদ্রূপ একটা কিছু করিবার জন্য নিতান্ত আকাঙ্ক্ষা হইল। বন্ধুগণের নিকট তাহার প্রস্তাব করিলাম; তাহাতে কবিবর আনন্দচন্দ্র মিত্র, বাবু শ্রীনাথ চন্দ, বাবু শরচ্চন্দ্র রায়, বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বাবু রমাপ্রসাদ বিষ্ণু প্রভৃতির সহানুভূতি ও উৎসাহ পাইলাম। স্থানীয় ভারতমিহির পত্রিকায় এ সম্বন্ধে এক পত্র প্রেরণ করিলাম। বাবু অনাথবন্ধু গুহ তাঁহার সম্পাদকীয় স্তম্ভে সে পত্র গ্রহণ করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিলেন।

এইরূপে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে) বসন্ত পঞ্চমীর দিনে "সারস্বত সমিতি" নাম লইয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ছিলাম। সে আজ কত বৎসরের কথা! তখন যাহারা যুবক ছিল এখন তাহারা বৃদ্ধ হইয়াছে, যাহারা বালক ছিল তাহারা প্রৌঢ় হইয়াছে। সমিতির শুভানুধ্যায়ী ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বহুলোক জীবন চক্রের পরিবর্ত্তনে নানা দিগ্‌দেশে প্রস্থান করিয়াছেন, আবার অনেকে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। নিতান্ত ক্ষুদ্র শক্তি সম্পন্ন কতিপয় বন্ধু বান্ধব একত্রে সম্মিলিত হইয়া যখন আমরা এই সারস্বত উৎসবের প্রথম অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তখন কে কল্পনা করিয়াছিল যে ইহা এমন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে? অনেক সভা সমিতি ও উৎসবাদির অভ্যুদয় এবং উত্থান পতন আমরা ময়মনসিংহ নগরে দেখিয়াছি কিন্তু

তাহার কোন একটিকেও বহুদিন স্থায়ী থাকিতে দেখি নাই। বিধাতার করুণায় আমাদের প্রিয় সারস্বত সমিতি অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। এক্ষণে সমিতির পূর্ব্ব কাহিনী স্মরণ করিয়া সেই পূর্ব্বকার কোন কোন বন্ধুর সহিত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, বড় আনন্দ বোধ হয়। তাই মনে হইতেছে এই দীর্ঘকাল ব্যাপিনী চেষ্টা উদ্যোগ ও যত্নের দ্বারা সারস্বত সন্তানগণ কি করিয়াছেন, কিরূপে সুখ দুঃখ, উৎসাহ উদ্যম, আশা ও আশঙ্কাদির মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, সমিতির অবস্থা আরব্ধ সময়ে কিরূপ ছিল, পরেই বা কিরূপ হইয়াছিল, তদ্বারা স্থানীয় দেশী ও বিদেশী, উচ্চ ও নীচ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল প্রকার লোকের কিরূপ উপকার হইত, ইত্যাদি সকল বিষয় স্মরণ পূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলে বর্ত্তমান ও ভাবীকালের যুবকবৃন্দ তাহা পাঠ করিয়া সারস্বত সমিতির জীবন রক্ষা ও তাহার উন্নতিকল্পে সমধিক উদ্যমশীল হইবেন এবং সেকালের প্রাচীন বন্ধুগণও সেই "পুরাতন পাঠ" একবার দেখিয়া সুখী হইবেন।

এখন যে স্থানে বালিকা বিদ্যালয়ের বোর্ডিং স্থাপিত হইয়াছে সেইখানে মুড়াপাড়ার জমিদার বাবু কালীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানা একতালা পাকা বাড়ী ছিল, সারস্বত সমিতির প্রথম অধিবেশন সেই বাড়ীতেই হইয়াছিল। মুক্তাগাছার জমিদার স্বনামখ্যাত মহাত্মা কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরীকে সভাপতি করিয়া আমরা এই জাতীয় উৎসব আরম্ভ করিয়াছিলাম। সভাপতির আসন সুশোভিত করিবার জন্য তিনিই সম্পূর্ণ উপযোগী ছিলেন। তাঁহার সেই সগর্ব্ব গ্রীবাভঙ্গিযুক্ত সৌম্য মূর্ত্তি, সেই গৌরববিস্ফারিত চক্ষুর চাহনির সঙ্গে সঙ্গে সেই ভ্রূকুঞ্চন আজিও যেন আমার চক্ষুর উপর ভাসিতেছে। তিনি যখন যে কোন সভা সমিতিতে উপস্থিত হইয়াছেন সেখানেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান অধিকার ও

অলঙ্কৃত করিয়াছেন; এবং সর্ব্বদা সৎসাহসের পরিচয় দিয়া সগর্ব্বে আপন পদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। এই সমিতির প্রথম অধিবেশনে তিনি স্বহস্তে সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে পান ও আতর পরিবেশন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কতিপয় বৎসরেও তিনি আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত ইহার কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

এই বসন্তোৎসবের জন্য উপলক্ষে আমি দুইটী সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলাম এবং আমাদের অন্যতর বন্ধু কবিবর আনন্দচন্দ্র মিত্র "বাণীস্তোত্র" লিখিয়াছিলেন। বাণীস্তোত্র এক উপাদেয় কবিতা হইয়াছিল এবং 'বান্ধব' নামক মাসিক পত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সঙ্গীতগুলিকে তানলয়ের সহিত সম্মিলিত করিয়া গাইবার জন্য বাবু রামকুমার চৌধুরী ও বাবু রমাপ্রসাদ বিষ্ণু নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং রামকুমার চৌধুরীর কনসার্টের সহিত মিলাইয়া রমাপ্রসাদ বিষ্ণু তাঁহার সুললিত কণ্ঠে সেই সকল সঙ্গীত গান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

বাণীস্তোত্র হইতে আমরা সমস্বরে গাইতাম—

বাল্মীকি-গৌতম-ব্যাস,
মৃত্যুঞ্জয় কালিদাস,
শঙ্কর, ভারত সুপ্ত ভারত শ্মশানে।
অযোধ্যা অবন্তি পুরী
মথুরার সে মাধুরী
হারায়ে কপাল দোষে ভারত দুখিনী ও।
জয় বিদ্যে জগত জননী
জীবন মুক্তি প্রদায়িনী
কলুষনাশিনী ভবে
জয়দে বরদে বাণী ও।

মধুর মলয়ানিলে, গায় ভ্রমরে কোকিলে,
বসন্তে তোমার গুণ বসন্ত-বাসিনি!
আহা কিবা সুখ সঙ্গ, নাহি স্বর তাল ভঙ্গ,
হাসিছে কুসুম, নাচিছে তারা খেলিছে তরঙ্গিণী ও।
জয় বিশ্বে জগতজননী ইত্যাদি।

* * * * * * *

অপরূপ দেখরে চাহিয়ে,
বসেছেন আনন্দে মায়েরে লইয়ে,
সারস্বত সুত যত মধ্যে বীণাপাণি ও।
জয় বিশ্বে ইত্যাদি।

এই সকল পদাবলী যখন আমরা সমস্বরে গাইতাম তখন কত যে আনন্দ অনুভব করিতাম, কত যে উৎসাহ ও উল্লাসে প্রাণ পরিপূর্ণ হইত তাহা এখন বলিয়াও কাহাকে বুঝাইতে পারি না। যে দুইটী বন্ধুর নাম উল্লেখ করিয়াছি, যাহাদের দ্বারা আমাদের প্রথম উৎসবের সঙ্গীত সঙ্গতের কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল সে দুজনেই অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছেন।

হিন্দু ও মুসলমান, ব্রাহ্ম ও খৃষ্টিয়ান, রাজা ও প্রজা, ধনী ও দরিদ্র, জাতি বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে একত্র সম্মিলিত হওয়ার এমন স্থান আর ছিল না; বাগ্‌বাদিনী বীণা-পাণির নামে আহ্বান করাতে এই সকল বিভিন্ন সমাজের লোক এক সমতল ক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া পরস্পরে প্রাণ খুলিয়া আলাপ পরিচয় করার ও বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ করার সুযোগ পাইয়াছিলেন তাই স্থানীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহাতে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, জেলার ভূম্যধিকারীগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ছাত্রগণ ইহার উৎসাহে উন্মত্ত হইয়াছিল, এমন কি অন্তঃপুরে থাকিয়া মহিলাগণ পর্য্যন্ত ইহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তিন বৎসর পর্য্যন্ত কেবল বিশুদ্ধ আমোদ ও সুহৃদ সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিয়াই সমিতির কার্য্য শেষ হইয়াছিল। চতুর্থ বর্ষে বাবু প্রাণকুমার দাস ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ইহার নেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার জীবন্ত উৎসাহ, ঐকান্তিক যত্ন ও অটুট পরিশ্রম দ্বারা এই সমিতি যে উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা আমরা কখনও ভুলিতে পারিব না। দেশীয় ভূম্যধিকারী মহোদয়গণের অনুগ্রহ-দৃষ্টি ইতিপূর্ব্বেই এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রাণকুমার বাবু ইহাতে প্রবেশ করিয়া উচ্চ-পদস্থ সমুদয় রাজকর্ম্মচারীর সহানুভূতি ও সাহায্য সংগ্রহ করিলেন। সদাশয় জমিদারগণের উৎসাহ স্রোত দ্বিগুণ প্রবাহে প্রবাহিত হইল, সমিতির জীবনে নূতন বল সঞ্চারিত হইল, ইহার উন্নতির এক নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। এই হইতে আমরা প্রদর্শণী খুলিয়া দেশের শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধন মানসে পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করিলাম। সেই প্রাণকুমার বাবুর অনুরোধে ডিষ্ট্রীক্ট জজ্ মেঃ কার্কউড সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী জজ মেঃ হার্ডিং সাহেবও সারস্বত সমিতির সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন এবং প্রদর্শনীতে নানা-বিধ কৃষিজাত দ্রব্য দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার সেসন কোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার আধিক্যের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "Gentlemen, I thought that Mymensing could produce only broken heads and lacerated wounds and compound fractures, but I am now very glad to see that she can produce many other things of which she may be proud."

উক্ত জজ বাহাদুরদিগের উৎসাহে সমিতির অনেক উন্নতি হইয়াছিল; তাঁহাদের দৃষ্টান্তে সবজজ ও মুনসেফ এবং ডেপুটী বাবুদিগের অনেকে

আগ্রহের সহিত ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। বাবু বিপিনচন্দ্র রায় ডি,এল নেত্রকোণাতে মুনসেফী করিতেন, শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব্ব দিবস সেখানে কাছারীর কাজ শেষ করিয়া ঘোড়ায় চড়িতেন আর ২৪ মাইল পথ চলিয়া যাইয়া সারস্বতের সান্ধ্যসম্মিলনে উপস্থিত হইতেন,—কেমন উৎসাহ! বাবু প্রাণকুমার দাসের পর ডেপুটী কালেক্টর বাবু শশিকুমার দত্ত ও বেগুনবাড়ীর কুঠীর ম্যানেজার বাবু নবীনচন্দ্র সেন সমিতির কাজে কিছুকাল খাটিয়াছিলেন। ফৌজদারীর হেড্ ক্লার্ক ও সিরিস্তাদার বাবু অন্নদাপ্রসাদ দাস, সদরের সিনিয়র পুলিস ইনস্পেক্টার বাবু শিবকিশোর রায়, জজ কোর্টের ট্রেন্স্লেটার বাবু মহেন্দ্রকুমার বসু ও সবজজ আপিসের সিরিস্তাদার বাবু সারদাপ্রসাদ লাহিড়ী এই সমিতির শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অন্নদা বাবু ও শিবকিশোর বাবুর স্বাক্ষরিত পত্রে মফঃস্বলের পুলিস ও অপর কর্ম্মচারীগণ আহুত হইয়া আহ্লাদ সহকারে ইহার কার্য্যে যোগ দিতেন ও যথোচিত অর্থ সাহায্য করিতেন। মহেন্দ্র বাবু নাট্যশালার ভার গ্রহণ করিয়া তাহার কাজ সুসম্পন্ন করিতেন। ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ মেঃ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামই উল্লেখ যোগ্য। তিনি এই সমিতির নির্ব্বাচিত বক্তা এবং সভাপতি উভয় পদেই বৃত হইতেন এবং নিপুণতার সহিত উভয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া তাঁহার আপন গৌরব বর্দ্ধিত করিতেন।

উকিলদিগের মধ্যে কাহার নাম ছাড়িয়া কাহার নাম আমি উল্লেখ করিব? সেই প্রাচীন উকিল বাবু গঙ্গাধর ঘোষ, গঙ্গাদাস গুহ ও কালীশঙ্কর গুহ হইতে আরম্ভ করিয়া নবীন যুবক রেবতীশঙ্কর রায় ও বৈকুণ্ঠনাথ সোম পর্য্যন্ত 'বারে'র প্রায় সকল মেম্বরের নিকটেই আমাদের সারস্বত সমিতি অতি আদরের জিনিষ, সকলেই ইহাতে অনুরক্ত এবং ইহার পরিচর্য্যায় সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। এই সাধারণ মন্তব্যের পর

২।১টি ব্যক্তির নাম বিশেষরূপে উল্লেখ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বাবু জানকীনাথ ঘটক তন্মধ্যে একজন। প্রতি বৎসর এই উৎসবের আয়োজন উদ্‌যোগের আরম্ভ হইতে ব্যাপার উদ্‌যাপন পর্য্যন্ত ইনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ইহার জন্য খাটিয়াছেন, বড় ছোট কত লোকের নিকট যাতায়াত করিয়াছেন, কত জনকে খোষামোদ করিয়াছেন। সমিতির কাজে কোথাও কোন বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রাণে বিষম বাজিয়াছে। বিশেষ উল্লেখ যোগ্য অপর ব্যক্তি ছিলেন বাবু শ্রীকণ্ঠ সেন। ইনি আমাদের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন; তিনি এখন পরলোকে। তিনি যে ভাবে সারস্বত সমিতির পরিচর্য্যা করিয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা সমিতির পক্ষে নিতান্ত অন্যায় হইবে। যে-যে বৎসর শ্রীকণ্ঠ বাবু প্রধান উদ্‌যোক্তা হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই বৎসর বসন্ত পঞ্চমীর মাসাধিক কাল পূর্ব্ব হইতে কাছারী যাওয়া রহিত করিয়া তাঁহার ওকালতীর সেই বিস্তীর্ণ পসার মাটী করিয়া ইহার জন্য খাটিয়াছেন। চাঁদার টাকা উষল করিয়া আদায় প্রতিক্ষা না করিয়া ছেভিং ব্যাঙ্ক হইতে নিজের গচ্ছিত টাকা উঠাইয়া আনিয়া সমিতির কাজে ব্যয় করিয়াছেন। মুক্তাগাছা রামগোপালপুর ও গৌরীপুরে কত ছুটা ছুটী করিয়াছেন গাড়ী ভাড়াই বা কত দিয়াছেন! তাঁহার আত্মা পরলোকে শান্তি সুখ সম্ভোগ করুক ইহাই জগদীশ্বর নিকট আমাদের প্রার্থনা। বাবু ব্রজনাথ বিশ্বাস নির্ব্বাচিত বক্তার বক্তৃতা মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া গভীর গবেষনাপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছেন সে জন্য তাঁহার নামও উল্লেখ যোগ্য।

মোক্তারদিগের মধ্যে বাবু প্যারীলাল ঘোষ, বাবু কিশোরীমোহন বকশী ও বাবু গিরীশচন্দ্র গাঙ্গুলীর নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইঁহারা প্রথম হইতেই সমিতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও পরিচারক হইয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু মৌলবী হামিদ উদ্দীন আহাম্মদের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতেছি, তিনি পূর্ব্বাপর এই সমিতির কার্য্যে বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছেন এবং উদারভাবে হিন্দুদিগের সহিত মিলিয়া কাজ করিয়াছেন। যবন শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া এই উৎসব ক্ষেত্রে আমরা ম্লেচ্ছ বুঝাইবার জন্য যবন শব্দ ব্যবহার করিতাম এবং তাহা মুসলমানদিগের উপর প্রয়োগ করিতাম। মৌলবী হামিদ উদ্দীন তাহা দেখিতে পাইয়া কাহারো সহিত বিবাদ বিসম্বাদ না করিয়া সহিষ্ণু চিত্তে কেবল মাত্র প্রতিবাদ করিয়া করিয়া আমাদের ভ্রম বুঝাইয়া দেন তাহাতে যবন শব্দের প্রয়োগ একবারে রহিত হইয়া যায়। এ নিমিত্ত মৌলবী সাহেব আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। অপর মুসলমান হয়তো রাগ করিয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া যাইত কিন্তু সদ্বিবেচক হামিদ উদ্দীন তাহা করেন নাই। মুন্সী জহিরউদ্দীনও প্রদর্শনী ইত্যাদিতে সমিতির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। আহলে হুসেন বক্স্ বেপারীর নাম উল্লেখ করা সমুচিত। এই ব্যক্তিও উৎসবের কার্য্যে আমাদেব সঙ্গে সঙ্গে মাতিয়া যাইত এবং আকুয়া ও মেহরা গ্রাম হইতে লোক জন সংগ্রহ করিয়া দলবলে নামিয়া সারস্বত প্যাণ্ডল বা পেভিলিয়ন প্রস্তুত করিত, তাহাতে গেলারী বসাইয়া ও অন্যান্য ফার্ণিচার আনিয়া সাজাইত। তাহার অভাব বোধ হয় সারস্বত সন্তানগণ এখনও অনুভব করিয়া থাকেন।

জমিদার মহাশয় দিগের কথা কি আর বলিব। তাঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে, আবার কাহাকে ছাড়িয়া আমি কাহার নাম লিখিব সেও দেখিতেছি আমার এক বিষম বিপদ। সাধারণ ভাবে নিকটস্থ কি দূরস্থ সকল ভূম্যধিকারীই ন্যূনাধিক পরিমাণে অর্থ সাহায্য দ্বারা সমিতির জীবন রক্ষা ও তাহার উন্নতি করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাকে এতই ভালবাসেন যে এই ব্যাপারকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য

এখন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কোন উইল করিবার কালে তাহাতেও সারস্বত সমিতির চাঁদার কথাও উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং ইষ্টেটের অন্যান্য আবশ্যকীয় খরচের ন্যায় এই খরচটাও যাহাতে অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে যে সকল মহাত্মা সশরীরে সারস্বত ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া নানা প্রকার শারীরিক ও মানশিক ক্লেশ ও অসুবিধা সহ্য করিয়াও তাহাতে বিপুল আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, এই সারস্বত সমিতির স্মৃতি রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নামের স্মৃতি রক্ষা করাও আমি কর্ত্তব্য মনে করিতেছি; সুতরাং এই স্থানে মহানুভব কেশবচন্দ্র আচার্য্যচৌধুরী, মহারাজা সূর্য্যকান্ত ও রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য, বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ ও অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, বাবু দুর্গাদাস আচার্য্য, গোপালদাস আচার্য্য ও বরদাকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায়, কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ও বাবু ধরণীকান্ত লাহিড়ী, রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরী, বাবু দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য এবং প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রায় বাহাদুরের নাম লিপিবদ্ধ করিলাম।

ডাক্তার শ্রেণীর মধ্যে বাবু বরদাকান্ত বসু, বাবু সারদাকান্ত দাস ও বাবু তারানাথ বলের নাম উল্লেখ যোগ্য।

আমি সারস্বত কবি বলিয়া তাঁহাদিগকেই অভিহিত করিব যাঁহারা বর্ষে বর্ষে এই উপলক্ষে নূতন কবিতা রচনা করিয়া সমিতিকে উপহার দিয়াছেন। কবি আনন্দচন্দ্র মিত্রের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, তারপর কবি দীনেশচরণ বসু ও কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস। ইঁহারা দুজনেই, বিশেষতঃ গোবিন্দ বাবু যে সকল উৎকৃষ্ট কবিতা উপহার দিয়া সারস্বত সমিতির গৌরব বর্দ্ধন ও বিদ্বজ্জনের হর্ষোৎপাদন করিয়াছেন স্মরণ করিলে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়।

সমিতির ব্যাপার যখন প্রকাণ্ড কাণ্ডে পরিণত হইল তখন পানাশক্ত এবং বাই খেমটায় ভক্ত অনেক বাবুর দল আসিয়া ইহাতে ঢুকিলেন। কিন্তু সারস্বত সমিতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রথম হইতেই সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও বন্দোবস্ত ছিল। "বিশুদ্ধ" আমোদ ভিন্ন কোন প্রকার অশ্লীল বা কলুষিত আমোদের প্রস্তাব করিতে কেহ সাহস করে নাই। ব্রাহ্ম সমাজের বা ব্রাহ্ম স্পিরিটের অথবা ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন লোকদিগের হস্তে এই সমিতির কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব ভার সমধিক পরিমাণে ন্যস্ত হইয়াছিল বলিয়াই ইহার পবিত্রতা সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ ছিল। বর্ষে বর্ষে ভায়া অমরচন্দ্র দত্তকেই কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইত। একটি পয়সাও তাঁহার হাত ছাড়া খরচ হইবার যো ছিল না এবং অমর বাবুর কাছে পান ভোজনের কথা দূরে থাক একটি ছিগারেটের পয়সাও কেহ চাহিতে পারে নাই। সারস্বত মণ্ডপে পান তামাক খাইতে কোন বাধা ছিল না কিন্তু পান করিতে হইলে তাহা যে শুধু আপন ব্যয়ে করিতে হইবে তাহা নহে সে কার্য্য আপন বাড়ীতেই করিয়া আসিতে হইবে এমন কি তদগন্ধযুক্ত হইয়াও মণ্ডপে প্রবেশ নিষেধ ছিল।

বিশুদ্ধ আমোদ যোগাইবার জন্য নানা প্রকারের গান বাদ্য ও নাটকাভিনয় হইত এবং কলিকাতা হইতে কখনও সার্কাস্ কখনও 'ফেনটাস্ মেগোরিয়া' আনা যাইত। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর হইতে রাগ ও রস প্রদর্শনের ছবিযুক্ত বই আনাইয়া এখানে তাহার অভিনয় করা হইয়াছিল। একবার এক সার্কাস্ পার্টিতে দেখা গেল কয়েকটী স্ত্রী-লোক আনা হইয়াছে। অমনি বিষম হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সারস্বত ক্ষেত্রে বেশ্যাভিনয় হইতে দেওয়া হইবে না বলিয়া ঘোর আপত্তি উপস্থিত হইল। পরিশেষে মীমাংসা হইল যে সার্কাস পার্টিতে যে কয়েকটী স্ত্রীলোক আসিয়াছে তন্মধ্যে নিতান্ত ছোট ছোট যে দুইটি বালিকা আছে তাহাদের খেলা দেখিতে কোন

আপত্তি নাই অপর কয়টী তাহাদের বাসাতেই থাকিবে, সারস্বত প্যাণ্ডেলে যাইতে পারিবে না। কার্য্যতঃ তাহাই হইল। এইরূপ করিয়া পবিত্রতা রক্ষা করা হইত।

এই স্বারস্বত ক্ষেত্রে কত কৌতুকাবহ ঘটনাই ঘটিয়াছে, কত আনন্দজনক দৃশ্যই দেখিয়াছি, কত দুঃখ ও দুশ্চিন্তাতেই মগ্ন হইয়াছি, সে সকল দুঃখ, আনন্দ এবং কৌতুকের কাহিনী স্মরণ করিলে এখন প্রাণে অপরিসীম সুখের উদয় হয়।

একবার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মেঃ গ্লেজিয়ার সাহেবকে ইহাতে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল, তিনি বলিয়া বসিলেন কি, যে ইহাতে idolatry (পৌত্তলিকতা) আছে সুতরাং তিনি আসিবেন না। আমরা শুনিয়া অবাক এবং ভাবিয়া ব্যাকুল হইলাম। ব্যাকুল হইলাম এই ভাবিয়া যে আমরা বসন্ত পঞ্চমীর উৎসব এক নূতনতর প্রণালীতে সম্ভোগ করিবার জন্য হিন্দু, মুসলমান ও ব্রাহ্ম খৃষ্টান জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে একত্রে মিলিয়াছি, সুতরাং বীণাপানীর মূর্ত্তি গড়িয়া তাহাতে পুষ্পাঞ্জলী দেওয়া তো আমরা ছাড়িয়াই দিয়াছি, অতঃপর বালকদিগের হস্তে যে সে কাজ ন্যস্ত হইয়াছিল তাহারাও সেটা এই সারস্বত সমিতির জন্যই বিলোপের পথে আনিয়াছে, কারণ তাহারা এখন বাড়ীতে কিরূপে তাড়াতাড়ি একটা অঞ্জলী নিক্ষেপ করিয়া উৎসবক্ষেত্রে ছুটিয়া যাইবে সেজন্যই ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এদিকে তো এই অবস্থা, ওদিকে সাহেব বাহাদুর বলিয়া বসিলেন ইহাতে পৌত্তলিকতা আছে, সুতরাং তিনি আসিবেন না। স্কুলের মাঠে স্বারস্বত প্যাণ্ডেল হইয়াছিল তাহা গবর্ণমেণ্ট ল্যাণ্ড। সাহেব বলিয়া পাঠাইলেন সেখানে রবিবারে গান ড্রাম্ প্রভৃতি আমোদ করা যাইবে না, কারণ সেটা Sabbath day (স্যাবাথ ডে)। জামালপুরের মেলার মাঠে পূজা করিয়া যে কালী মূর্ত্তি রাখা হইয়াছিল

স্বর্গীয় মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য

এই গ্রেজিয়ার সাহেব তাহা ফেলাইয়া দিয়াছিলেন এবং শেষে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কৈফিয়ৎ তলব করিলে বলিয়াছিলেন, যে তিনি খৃষ্টিয়ান ল্যাণ্ডে এরূপ মূর্ত্তি রাখিতে দিতে পারিবেন না। জামালপুরের মেলার স্থানটা গবর্ণমেণ্টের খাস মহাল কি না, তাই খৃষ্টান লেণ্ড। তখন ময়মনসিংহ নগরে টাউনহল হয় নাই। এমন একটা সাধারণ স্থান ছিল না যেখানে শতাবধি লোককে ডাকিয়া বসিবার স্থান দেওয়া যাইতে পারে। আমরা গত্যন্তর না দেখিয়া সাহেব বাহাদুর যাহা বলিলেন তাহাতেই 'তথাস্তু' বলিলাম। রাজা সূর্য্যকান্ত স্বয়ং সহরে উপস্থিত ছিলেন, তিনি সকল কথা শুনিলেন। টাউনহলের অভাব এবার যেরূপ তীব্র ভাবে সকলের হৃদয়ে বাজিয়াছিল ইতিপূর্ব্বে আর কখনও সেরূপ হয় নাই। তোমার আমার হৃদয়ে বাজিলে কি হয়? কিন্তু এবার রাজা সূর্য্যকান্তের হৃদয়ে বিষম বাজিয়াছিল বলিয়া কাজ হইল। আমাদের টাউনহলের অভাব বিদূরিত হইল। অচিরে প্রকাণ্ড ও প্রশস্ত টাউনহল নির্ম্মিত হইল। আমরা সূর্য্যকান্ত হল প্রাপ্ত হইয়া বহুদিনের অভাব মোচন করিলাম।

সারস্বত কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস একবার তাঁহার কবিতায় লিখিলেন—

ভাই! কেন এ মৃন্ময়ী মূর্ত্তি মিছে পূজ আর?
তিলে তিলে অবিরত, গেল বর্ষ কত শত,
তবু এ পূজার আশা মিটে না তোমার?
কেন এ মাটির দেহে, এত ভক্তি এত স্নেহে,
প্রীতির সুবর্ণ পুষ্প দেও উপহার?
কি দেবত্ব নিরখিয়া বলহে ভুলিল হিয়া
এই পরিণাম তব উন্নত আত্মার?
কেন ওই মৃত মূর্ত্তি পূজ মৃত্তিকার?

কেন ওই মৃত মূর্ত্তি পূজ মৃত্তিকার ?
শুনেছ কাহার কাছে, মাটিতে মমতা আছে,
বোঝে কি মাটীর মন যাতনা কাহার ?
চিরিয়া দেখ ও বুক, নাহি রক্ত একটুক,
নাহিক ধমনী শিরা নাহি রক্তধার,
যেখানে পরাণ থাকে লুকাইয়া আপনাকে
কেবলি মাটীতে ভরা মাটী তথাকার।
নাহিক চৈতন্ত বোধ, সুখ দুঃখ হর্ষ ক্রোধ,
আছে ও নির্দ্দয় চক্ষু নাহি অশ্রুধার,
আছে অকর্ম্মণ্য হস্ত, নিত্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত
বিপদে বিপন্নে নাহি দয়ার প্রসার
কেন ওই মৃতমূর্ত্তি পূজ মৃত্তিকার ?

ভাই ! কেন এ মৃন্ময়ী মূর্ত্তি মিছে পূজ আর ?
কি আকাঙ্ক্ষা কি বাসনা, কি প্রার্থনা কি কামনা,
কি যে সে গভীর গুপ্ত উদ্দেশ্য তোমার
মৃত মৃত্তিকার কাছে, কি তোমার আশা আছে
হায় মূর্খ ? এ যে দুঃখ নহে বলিবার,
কার কর উপাসনা, কি লাঞ্ছনা বিড়ম্বনা,
ভারতী জননী কিরে মৃন্ময়ী তোমার ?
যেই সর্ব্বশক্তিময়ী, তারি কি প্রতিমা অই
অচেতন জড়পিণ্ড মৃত মৃত্তিকার ?
যে বীণার বীরগান, জাগাইত মৃত প্রাণ
অই কি সে সঞ্জীবনী বীণা সারদার
হা মূর্খ কেমনে হয় বিশ্বাস তোমার ?

ইহাতে সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্মানুষ্ঠানকে আক্রমণ করা হইয়াছে বলিয়া হৈ চৈ পড়িয়া গেল এবং প্রাচীন সম্প্রদায়ের কাহারো কাহারো মনে একটা খট্‌কা বাধাইয়া দিল। ইহার বিচারের জন্য কমিসন বসিল এবং সৌভাগ্যের বিষয় যে বিচারে মীমাংসা হইল ইহাতে কোন সম্প্রদায়কে আক্রমণ করা হয় নাই। যদিও মৃন্ময় মূর্ত্তির অসাড়তা প্রতিপাদন করিয়া কতিপয় কবিতা লিখা হইয়াছিল তথাপি তদ্দ্বারা কোন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের নিন্দাবাদ করা কবির উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা নিস্কৃতিলাভ করিয়া হাঁপ ছাড়িলাম। যদি কবিবর এই মোকদ্দমায় ডিক্রী না পাইতেন, জানি না তাহা হইলে কত জনার সহানুভূতি ও সাহায্য হইতে সারস্বত সমিতিকে বঞ্চিত হইতে হইত।

ঘোড়দৌড়ের মাঠে যখন সহস্র সহস্র লোক উপস্থিত হইত, যখন ইংরেজ ও বাঙ্গালী ভদ্র মহোদয়গণ সেই জনাকীর্ণ মাঠে সমবেত হইতেন, যখন ব্যাণ্ডের মনোমুগ্ধকর বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া বালকের দল সেখানে ছুটিয়া আসিত এবং যখন লোহিত উষ্ণীষধারী পুলিশের দল শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সেই মাঠে প্রেরিত হইত, তখন বাবু জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী (যিনি পরে রাজোপাধী প্রাপ্ত হইয়াছেন) সুবর্ণ খচিত সুন্দর পরিচ্ছদে পরিশোভিত হইয়া প্রকাণ্ড এক ওয়েলারে আরোহণপূর্ব্বক সেই জনতা মধ্যে সমুপস্থিত হইতেন। এবং পরস্পর প্রতিদ্বন্দী অশ্ব পরিচালকদিগের অশ্বচালনা পরিদর্শন করিয়া তাহাদের মধ্যে কে কোন্ পুরস্কার পাইবার উপযোগী তাহা নির্দ্ধারণ করিতেন। সে যে কি মনোহর দৃশ্যই দেখিয়াছি তাহা ভুলিতে পারি না। যদি চিত্রকর হইতাম, যদি তুলী হাতে করিয়া ছবি আঁকিতে পারিতাম তবে "সারস্বত ক্ষেত্রে অশ্বপৃষ্ঠে জগৎকিশোর" যে কি সুন্দর ছবি, কি প্রিয় দর্শন দৃশ্য তাহা এখানে লিখিয়া দেখাইতাম। সেই প্রকাণ্ড অশ্ব কেবল মাত্র

পশ্চাতের পদদ্বয়ে ভর করিয়া সম্মুখের পদদ্বয় ঈষৎ বক্রভাবে শূন্যে উঠাইয়া হট্টগোলকারী দর্শকদিগকে কতকটা পেছনে সরাইবার মানসে, তাহাদের উপরে পা ফেলিয়া দাঁড়াইবে এরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া, আবার তাহার সেই সুদক্ষ আরোহীর হস্ত সঞ্চালনে, কখনও দক্ষিণে কখনও বামে ঘুরিয়া দাঁড়াইত, লোক গুলি মাথার উপরে ঘোড়ার পা, তাহাতে লৌহ নির্ম্মিত পাদুকা, রজতবর্ণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে দেখিয়া অমনি সরিয়া পড়িত। সে সুন্দর ছবি যদি আঁকিতে পারিতাম তবে তাহা মনের সাধে চিত্রিত করিয়া সারস্বত মণ্ডপের দেয়ালে ঝুলাইয়া রাখিতাম ;

স্কুলের মাঠে নানা প্রকারের ব্যায়াম ও ক্রীড়া প্রদর্শন হইতেছিল, দেখিলাম সেই মাঠে বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ ও অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী জমিদার মহাত্মাগণ দুর্ব্বা ঘাসের উপর যোড়াসনে বসিয়া গিয়াছেন এবং মনের আনন্দে উৎসব সম্ভোগ করিতেছেন। কাহারো আদর আহ্বানের প্রতীক্ষা করেন নাই, তাঁহাদের বসিবার উপযুক্ত আসন সংগ্রহের চেষ্টা করেন নাই। কি সুন্দর! কি প্রীতিপ্রদ দৃশ্য ? কাহার বাড়ীতে, কোন্ মহোৎসবে এরূপ দৃশ্য দেখিবার প্রত্যাশা করা যায় ? যদি আমাদের উদারচেতা জমিদার মহোদয়গণ প্রত্যেকেই এই ব্যাপারকে তাঁহার নিজের ব্যাপার ও আপন বাড়ীর উৎসব বলিয়া মনে না করিতেন তাহা হইলে কখনও এরূপ ঘটিতে পারিত না। এই "দুর্ব্বাসনে সম্ভ্রান্ত জমিদার" চিত্রকরের পক্ষে আর একটি উপাদেয় বিষয় বটে।

সারস্বত মণ্ডপে যখন রাগ ও রস প্রদর্শনের অভিনয় হইয়াছিল, তখন দেখিয়াছিলাম "রঙ্গমঞ্চে দেবেন্দ্রকিশোর" কি শোভন দৃশ্য ? আমাদের 'দেবনিবাসের' দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী সারস্বত সমিতির একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, তিনি আমাদের সকলের শুভ আশীর্ব্বাদ লইয়া লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছিলেন, ভরসা করি 'দেবনিবাসের' প্রতি রাজা

জগৎকিশোরের সকরুণ দৃষ্টি পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং দেবেন্দ্র বাবুর পুত্রগণ 'নিবাসের' পিতৃদত্ত নাম বজায় রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ডিপুটীমাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের উদ্যোগে একবার স্কুলের বালকদিগকে লইয়া এক 'অভিযান' করা হইয়াছিল। গেরুয়া বসন পরিহিত বালকবৃন্দ পতাকা হস্তে করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে চলিতে গাইয়াছিল "বন্দে মাতরম্"। সেকালে পার্টিসন অব বেঙ্গলের কথা কেহ স্বপ্নেও ভাবিত না এবং বন্দে মাতরম্ মূলমন্ত্র ধরিয়া "স্বদেশী আন্দোলন" নামে কোন আন্দোলন উপস্থিত হইবে ইহা কাহারো কল্পনাতেও স্থান পাইত না। তাই বালকদিগের সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ় ও যুবকের দলও ঐরূপে অভিযান করিয়া নগর ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। নগরের প্রশস্ত রাজপথে যখন কোমলকণ্ঠে বালকগণ আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া উচ্চৈস্বরে গাইয়াছিল—

"জয় ভারতের জয়,
হউক ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয়,
হউক ভারতের জয়"

তখন পার্শ্ববর্ত্তী ও পশ্চাদ্বর্ত্তী শ্রোতাদিগকে যেন একবারে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল। লোকগুলি আনন্দে মাতওয়ারা হইয়াছিল বটে কিন্তু কেহই এ কথা মনে করেন নাই যে ইহাতেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়া পড়িবে অথবা তাহারই চেষ্টায় এরূপ করা হইতেছে। পক্ষান্তরে এতাদৃশ সঙ্গীত বা অভিযান দ্বারাই ভারত সাম্রাজ্য বৃটিস সিংহের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িবে এরূপ আশঙ্কা করিয়া ব্যস্ত হইবার লোকও সেকালে রাজ-সরকারে ছিল না। কন্‌ফিডেনসেল রিপোর্ট করিবার লোকও ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না, সুতরাং কোন দিকেই ভয় ভাবনার কোন কারণ

ছিল না। বালকগণ প্রাণ খুলিয়া মনের আনন্দে গাহিয়া চলিল "জয় ভারতের জয়, হউক ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়"। আবার মাঝে মাঝে কতকদূর যাইয়াই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে লাগিল। অভিযান যখন এই ভাবে নাগরিক লোকদিগের চিত্তাকর্ষণ করিয়া চলিতেছিল তখন সেই জনসঙ্ঘ মধ্যে দেখিতে পাইলাম কালীপুরের জমিদার বাবু ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয় (তখন তাঁহার তরুণ যৌবন) আহ্লাদে ও উৎসাহে একবারে উৎফুল্ল হইয়াছেন আর বলিতেছেন "শুধু বালকেরাই কেন গায়? তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও কেন গাই না? চলুন, আমরাও বালকদের ন্যায় উচ্চৈস্বরে গাই 'জয় ভারতের জয়'।" সেই যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সৌম্য মূর্ত্তি এবং জীবন্ত উৎসাহে উৎফুল্ল ধরণী বাবুর মুখচ্ছবি অদ্যাপি আমার চক্ষুর উপরে ভাসিতেছে।

গ্রামবার্ত্তা পত্রিকার সম্পাদক বাবু হরিনাথ মজুমদার মহাশয় ধর্ম্ম প্রচার ও সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া যখন সাধকশ্রেষ্ঠ কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন তখন একবার তিনি তাঁহার দলের কয়েকটি ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া আমাদের সারস্বত উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গীত শুনিয়া আমরা একবারে আত্মহারা হইতাম। আহা! কি সুন্দর সে সকল গানের সুর, কেমন মনোহর সেই গায়কদিগের স্বর! যেমনি চমৎকার ভাব তেমনি আশ্চর্য্য রচনা। তাঁহারা গাইলেন—

(১) এই কি সেই আর্য্যস্থান, আর্য্যসন্তান?
যাঁদের তপো'বলে, যোগ বলে কাঁপিত দেবতার প্রাণ।।
যাদের যুদ্ধে যুদ্ধস্থল, সৈন্য করতো টল মল,
রক্ত স্রোতে ভেসে যেতো নদ নদীর জল,

বসে বৃক্ষোপরে, শূন্য ভরে, পাখী করতো রক্ত পান।
এই কি সেই আর্য্যস্থান। ইত্যাদি
বিধির বিধান চমৎকার, এখন সে আর্য্যকুমার
শিয়ালের রব শুনলে বান্ধেন ঘরের দুয়ার;
দেখলে রক্তজবা, শুকায় জিভা
চম্‌কে উঠে সবার প্রাণ॥
এই কি সেই আর্য্যস্থান, আর্য্যসন্তান?
কে হে ভাই! তুমি এ শ্মশান শয্যায়?
ছিলে যদি এই মুলুকের বাদশা
হায় রে কে করিল এহেন দশা?
তোমার সৈন্য বল, কল কৌশল, সে সকল
এখন কোথায়? কে হে ভাই তুমি এ শ্মশান শয্যায়?
ছিলে যদি তুমি মান্য মান
সম্মানে সব কুলীন প্রধান,
তোমার সে মান্য, কৌলীন্য,
প্রাধান্য, এখন কোথায়? কে হে ইত্যাদি

সে সময়ে কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ একদিন প্রাতে প্রাতঃকৃত্য করিতে ব্রহ্মপুত্র নদের চড়ায় গিয়াছিলেন, তখন নদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার যে ভাব হইয়াছিল সেই ভাবে ওখানেই এক গান রচনা করিলেন এবং বাসায় আসিয়াই গাইলেন—

কেন রে ঝরে নেত্র, ব্রহ্মপুত্র, আজ আমারে বল বল
ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম জানে না তাই লজ্জা হলো,
তাইতে নীল বসন দিয়ে মুখ ঢাকিয়ে
চড়ায় দেখাও বক্ষঃস্থল? ইত্যাদি।

সেই একই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও এই নগরে আসিয়াছিলেন। এই দুই সাধক একত্রে ব্রহ্মমন্দিরে যাইয়া উপাসনান্তে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনের বেলায় যখন ভাবে উন্মত্ত হইয়া হাত ধরা ধরি করিয়া নৃত্য করিতেন তখন তাহা দেখিয়া ভক্তিভরে আমাদের মন গলিয়া যাইত এবং তাঁহাদের চরণতলে লুটাইয়া পড়িতে ইচ্ছা হইত।

সেই বালিকা বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র গৃহে সমিতির প্রথম অধিবেশনের দিবসে সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে আমোদিত করিবার জন্য আমাদের প্রিয় বন্ধু ডাক্তার বরদাকান্ত বসু বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য কার্য্য ২।৪টা দেখাইয়া তৎপরে আর একটা আরম্ভ করিলে তাহাতে প্রভূত ধূমোদ্গিরণ হইয়া প্রায় সমস্ত ঘর অন্ধকার করিবার উপক্রম হইল, তখন সকলে হাসিতে হাসিতে ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন এবং "বসন্তে ভ্রমণং কুর্য্যাৎ" বলিয়া দলে দলে নানা দিকে চলিয়া গেলেন। ডাক্তার বসুর ঐ বৈজ্ঞানিক প্রদর্শন তাঁহার বন্ধুদিগের নিকট এক আমোদ জনক ঘটনা বলিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

সারস্বতের দুইটি সন্তান, অভিনয় উপলক্ষে রঙ্গমঞ্চে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুজনেই বৃহদ্বপু ও প্রভূত বলশালী, কিয়ৎকাল আস্ফালন ও পরস্পরের কৌশল এবং বল পরীক্ষার পর যখন একজন অপরকে ধরাশায়ী করিলেন তখন তাঁহার অভিনয়ের পাঠ ভুলিয়া গেলেন, কোথায় বলিবেন "এসো এখন তোমার রুধির পান করি," বলিয়া ফেলিলেন "এসো এখন তোমাকে 'ঈ' করি" দর্শক ও শ্রোতাগণ হাসিয়া অস্থির। এই আমোদ জনক ঘটনা আমাদের মনে এমনি ভাবে জাগ্রত ছিল; যে তাহার বহুদিন পরেও যখনই প্যারীবাবু বা কিশোরীবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে তখনই বলিয়াছি "এসো তোমাকে একবার 'ঈ' করি"।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বাঙ্গালা ১৩১৭ সনের বৈশাখ মাসে), ময়মনসিংহ নগরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্মিলন হইয়াছিল। সমস্ত বঙ্গদেশের গণ্য মান্য সাহিত্যসেবীও সাহিত্যানুরাগী বহু ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন, দেশপূজ্য বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সুসঙ্গাধিপতি মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ এবং কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁহার সহযোগী সভাপতি ছিলেন। আনন্দমোহন কলেজের প্রশস্ত প্রাঙ্গনে পরিষদের অধিবেশন হইয়াছিল। রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য প্রভৃতি স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণ সমাগত সাহিত্যিকগণের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়ে সারস্বত সমিতির এক প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল।

ডিষ্ট্রীক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ মেঃ ব্ল্যাকউড্ সভাপতি এবং বাবু অক্ষয় কুমার মজুমদার সেক্রেটারীর নেতৃত্বাধীনে মৌলবী ইছমাইল, বাবু তারকচন্দ্র চৌধুরী, নাজির যদুনাথ বিশ্বাস এবং আরো কতিপয় যুবকের বিশেষ চেষ্টায় এ বারের প্রদর্শনী পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রদর্শনী অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ও উচ্চ শ্রেণীর হইয়াছিল। সেই ১২৮৪ সন হইতে ১৩১৮ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকাল মধ্যে দেশের শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিষয়ে স্বাভাবিক ক্রমোন্নতি ব্যতীত ইতি মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন সমুপস্থিত হওয়াতে দেশের শিল্প ও শিল্পীদিগের মধ্যে যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে তাহাই এই বিশেষ উন্নতির প্রধান কারণ। এবারের মেলার নানাবিধ বিশেষত্বের মধ্যে ঐতিহাসিক প্রাচীন ঘটনা সমূহের স্মরণ সূচক যে সকল বস্তুজাত ও পুঁথীপত্র এবং ফলকাদি সংগৃহিত হইয়াছিল তাহা সমধিক মূল্যবান ও উল্লেখ যোগ্য। এবার লোকে পয়সা দিয়া টিকেট কিনিয়া মেলা দেখিয়াছে এবং তাহাতে মেলা ফাণ্ডে নিতান্ত সামান্য আয় হয় নাই।

দেশের গণ্য মান্য ও প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যসেবী মহাত্মাগণের সম্মিলনে আনন্দমোহন কলেজ প্রাঙ্গনে যে মনোহর দৃশ্য দেখিয়াছিলাম তাহাতে মন প্রাণ জুড়াইয়াছিলাম। যে আদর্শ কল্পনা-পটে অঙ্কিত করিয়া সারস্বত সমিতি আরম্ভ করিয়াছিলাম, সাহিত্য পরিষদের সম্মিলনে ও কার্য্যকলাপে তাহাই সম্পন্ন হইয়াছে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি এবং মনে করিয়াছি আমাদের ব্রত উদযাপিত হইয়াছে, অতঃপর এসকল রক্ষা করা ও সময় সময় পরিবর্ত্তন ও উন্নতি বিধান করা সম্পূর্ণরূপে ভাবীবংশের উপর নির্ভর করে। যে সকল যুবক নানাবিধ বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া বর্ষে বর্ষে আসিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন তাঁহারা মনোযোগী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলে আমাদের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই।

ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় কুচবিহারের রাজার সহিত আপন কন্যা সুনীতিবালার বিবাহ দিলেন, তাহাতে কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। বিবাহের প্রতিবাদীগণ "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নাম দিয়া নূতন সমাজ গঠিত করিলেন, কেশব বাবুর গঠিত "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে" তিনি তাঁহার দলের প্রচারক প্রভৃতিকে লইয়া রহিলেন এবং পরে তাহাকে "নববিধান" নামে অভিহিত করিলেন। কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে দলাদলির যে ভীষণ আবর্ত্ত উঠিয়াছিল তাহা ময়মনসিংহে আসিয়া পঁহুছিল। প্রথমে হিন্দুসমাজের যুবকগণ যখন ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হন তখন একবার প্রাচীনে ও নবীনে দলাদলি এবং কলহ বিবাদ দেখিয়াছিলাম, আবার ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া বহুদিন না যাইতেই প্রাচীনে ও নবীনে দলাদলী ও কলহ বিবাদ উপস্থিত দেখিয়া নিতান্তই ব্যথিত হইলাম। সাধারণ সমাজ হইতে "ব্রাহ্ম পাব্লিক ওপিনিয়ান্" (Brahmo Public Opinion) নামে ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইল। তাহাতে

কেশব বাবু ও তাঁহার দলের লোকদিগকে ঠাট্টা বিদ্রূপ ও আক্রমণ করিয়া কত কথা লিখা হইত। একদিন এক কবিতা বাহির হইল :—

"Too early to wed or to woo,
Both for a Brahmo as well as Hindoo,
Is wrong,' says the great Baboo.
But your little daughter, a gem,
And the Raja of Cooch, ah then,
'Cooch Perwa nei' says Keshab Chandra Sen"

এই সকল উপলক্ষ্য করিয়া কাছারীতে কত লোক কত আমোদ করিত; আমার তাহাতে কষ্ট বোধ হইত।

কলিকাতার ভীষণ আন্দোলনে যখন ব্রাহ্মসমাজকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দুই পৃথক স্রোতে প্রবাহিত করিল তখন মফঃস্বলের লোকদিগকেও বাধ্য হইয়া এ স্রোতে বা সে স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে হইল। রক্ষণশীল দলের প্রাচীন ও পদস্থ সভ্যগণ যখন যুবকদিগকে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মমন্দির হইতে তাড়াইয়া দিলেন তখন আর তাঁহাদের সঙ্গে সংশ্রব রক্ষা করা সম্ভবপর হইল না। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যারিষ্টার মিঃ আনন্দমোহন বসু এই সময়ে এক মোকদ্দমায় ময়মনসিংহ আসিয়াছিলেন; তিনি প্রকাশ্য বক্তৃতা দ্বারা কলিকাতার সকল অবস্থা এখানকার লোক-দিগকে বুঝাইয়া দিলেন এবং কি নিমিত্ত পৃথক সমাজ করা প্রয়োজন হইয়াছে তাহাও সকলের হৃদয়ঙ্গম করিলেন। স্বনামখ্যাত প্রচারক মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও তখন ময়মনসিংহ আসিয়াছিলেন, তিনি সাধারণ সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া দিলেন। ইনি এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উভয়েই কেশব বাবুর অনুগত এবং তাঁহার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন। ইঁহারা দুজনেই তাঁহাকে পরিত্যাগ

করিয়া যাইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিলেন। এই অন্তর্ব্বিবাদ ও আত্মকলহে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি ও সম্মানের অপচয় হইল; তৎপ্রতি সর্ব্বসাধারণের যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল এই দারুণ আঘাতে তাহা হ্রাস পাইতে লাগিল। এখন হইতে ব্রাহ্মসমাজে Constitution ও Discipline এর খুব আঁটাআঁটি দেখা গেল কিন্তু সাধন ভজন ধ্যান ধারণা ভক্তিযোগ ইত্যাদি ধর্ম্মভাব যেন অপেক্ষাকৃত শিথিল হইতে লাগিল। যেমন কলিকাতাতে তেমনি ময়মনসিংহে। মন্দিরে উপাসনা করার অধিকার লইয়া আদালতে মামলা মোকদ্দমা পর্য্যন্ত হইয়া গেল।

হিন্দু সমাজ এখন আর সেই পূর্ব্বকালের হিন্দু সমাজ নাই; এখন তাহাতে উদারতা ও প্রশস্ততা প্রভূত পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের বাল্যকালে ও যৌবনকালে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে যাইতে হইলে কত ভয়ে ভয়ে কত লুকাচুরি করিয়া যাইতে হইত, শুধু যে অভিভাবকদের ভয়েই ভীতচকিত হইতাম তাহা নহে প্রাচীন সম্প্রদায়ের ব্যক্তি মাত্রকেই যেন ভয় করিতে হইত। যিনি নিজে নীতিহীন ধর্ম্মহীন এবং স্খলিত চরিত্র তিনিও হিন্দু বলিয়া ও প্রাচীন সমাজের মুরব্বী বলিয়া নিরীহ যুবকদিগকে ব্রাহ্মসমাজে যাইতে দেখিলে কত শাসাইয়াছেন। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক সমাজের স্তরে স্তরে ও ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, একালের বালক ও যুবকগণ স্বাধীনভাবে চলিতে ও কায করিতে পারে, কোন দিক হইতে কোন প্রতিবন্ধক নাই; কিন্তু হায়, কি পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত যুবক ও শিক্ষার্থী বালকবৃন্দ দলে দলে ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া উপাসনা মন্দির পরিপূর্ণ করিতেছে না। কেবল যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই আমরা এরূপ নিরাশ ও সন্তপ্ত হইতেছি তাহা নহে; যেখানে যাই যে দিকে চাই সেখানেই শিক্ষাভিমানী যুবকদিগের কার্য্য কলাপ ব্যবহার ও

চরিত্র দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতে হয়। দেশে শিক্ষা বিস্তারের পর যে সকল দুর্নীতি ও কুসংস্কার সমাজ হইতে ও দেশ হইতে তাড়িত হইবে বলিয়া কত আশা করিয়াছিলাম সে সকল এখনও তেমনি প্রবল বা প্রবলতর বেগে আপন আপন অধিকার রক্ষা ও বিস্তার করিতেছে দেখিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারেন ? তবে কি হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান উদারতা ও প্রশস্ততার অর্থ আমরা ইহাই বুঝিব যে যুবকগণ প্রাচীন রীতি নীতি ও সমাজশাসনের শৃঙ্খল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া যাহার যে পথে ইচ্ছা চলিয়া যাইবে তাহাদের মধ্যে কোনরূপ ধর্ম্মবন্ধনের প্রয়োজন নাই ? এরূপ উচ্ছৃঙ্খল সমাজের পরিণাম কি হইবে ? তাহা কতকাল টিকিবে ? তোমরা ব্রাহ্ম সমাজের দোষ অনুসন্ধান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক ? বেশ কথা, তোমরা হিন্দু সমাজেই থাক, কেহ তোমাদিগকে ব্রাহ্মসমাজে যাইতে অনুরোধ করিবে না, কিন্তু যদি সেই বেদ বেদান্তের হিন্দু ধর্ম্মকে এবং ঐ সকল শাস্ত্র দ্বারা গঠিত হিন্দু সমাজকে কলঙ্কিত করিতে না চাও, যদি তাহার প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাও, তাহা হইলে, এবং প্রকৃত হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে তোমাদিগকে নীতিপরায়ণ ও চরিত্রবান হইতে হইবে, সকল প্রকার কুসংস্কার পরিবর্জ্জিত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের অস্তিত্বে ও বিধাতৃত্বে আস্থাবান হইতে হইবে এবং তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে। এইরূপে হিন্দু সমাজের সকল লোক ধার্ম্মিক ও উপাসনাশীল হইলে দেখিব, ঘরে ঘরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক পরিবারে সেই জগৎপিতা জগদীশ্বরের পবিত্র সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে।

আমি সর্ব্বান্তঃকরণে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে তিনি আমাকে কেশে ধরিয়া টানিয়া নিয়া ব্রাহ্ম সমাজের সংশ্রবে ফেলিয়া দিয়া রক্ষা

করিয়াছেন। নতুবা কোন্ দিন কোন্ স্রোতে ভাসিয়া কোথাকার নরক কুণ্ডে যাইয়া পড়িতাম তাহার ঠিকানা ছিল না। সমসাময়িক ও সমবয়স্ক অনেককেই তো দেখিয়াছি ধর্ম্মের বন্ধন না থাকাতে চরিত্র গঠন করিতে পারে নাই, কুসংসর্গে পড়িয়া তাহাদের নীতির বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে এবং পরিণামে স্খলিতচরিত্র হইয়া তাহারা যৎপরোনাস্তি অসুখে অথচ অসময়ে জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়াছে। সেই বন্ধুদিগকেও আজ ধন্যবাদ করি যাঁহাদের সংসর্গে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম বলিয়া মানসিক বল সঞ্চয় করিতে এবং চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছি।

১৮৭৭ সালে আমাদের জননীতুল্যা পরম শ্রদ্ধেয়া 'কুইন ভিক্টোরিয়া এম্প্রেস্ অব্ ইণ্ডিয়া (Empress of India) উপাধি গ্রহণ করেন। তখন গভর্ণর জেনেরেল লর্ড লীটন্ দিল্লীতে দরবার করিয়াছিলেন ও তদুপলক্ষে মফঃস্বলে ও জেলায় জেলায় নানাপ্রকার উৎসব আমোদ ও ধুম ধাম হইয়াছিল। ময়মনসিংহ সহর তখন বাস্তবিকই উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। আলাপসিং, ময়মনসিং, সেরপুর আটিয়া ও কাগমারী পরগণার জমিদার অধিকাংশই তাঁহাদের আপন আপন বাসাবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সহরময় জাঁক জমকের সীমা ছিল না। বাসায় বাসায় ও সড়কে সড়কে তোরণ দ্বার ও কদলীরোপণ, থিয়েটার, যাত্রা, বম-বাজি ইত্যাদি কত কিছু হইয়াছিল। সন্তোষের জমিদার বাবু দ্বারকানাথ রায় যে রোষণচৌকীর দল সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহাদের বাঁশীর (সানাইর) গান ও ঢোলকের তানে নাগরিক লোক-দিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত গানটি রচনা করিয়াছিলাম, বাবু রামকুমার চৌধুরী হারমোনিয়াম যোগে তাহা স্থানে স্থানে গাইয়া বহু লোককে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

চল সবে মিলে আজি
গাই ভারতের জয়
ভারতেশ্বরীর জয়
ভিক্টোরিয়া জয় জয় ॥

জল কুম্ভ পূর্ণ করে
নগরের ঘরে ঘরে
সাজায়েছে থরে থরে
দিয়ে নব কিশলয় ॥

দয়াবতী মহারাণী
মোদের জননী যিনি
রাজ রাজেশ্বরী তিনি
আর কারে করি ভয় ॥

স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন ও পরিত্যাগ এবং দাসত্বে প্রত্যাবর্ত্তন।

যখন দেখা গেল ২০।২২ টাকা বেতনের চাকরী দ্বারা মেসে খাইয়া সহরে হৈ চৈ করিয়া বেড়ান মাত্র চলে, তা ছাড়া সাংসারিক ও পারিবারিক কিছু সাহায্য হওয়া দূরের কথা, নিজে একটা খানসামা চাকর রাখিয়া বাসা খরচ করিয়া থাকাই চলে না; তখন আয় কিরূপে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে তাহাই চিন্তার বিষয় হইল। বন্ধুগণ পরামর্শ দিলেন আর কিছু না করিয়া একটা দোকান দিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় আরম্ভ করা যাইতে পারে। তখন তরুণ যৌবন নূতন উৎসাহ উদ্যমে হৃদয় মন পরিপূর্ণ। ভাবিলাম বেশ কথা, শুনিয়াছি "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী," একবার দেখা যাউক মা লক্ষ্মীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কি না। সেই দরিদ্রের জননী, দারিদ্র্য প্রদায়িনী মা স্বরস্বতীর সেবা তো যতদূর ভাগ্যে

ছিল তাহা করিয়াছি, এখন দেখি লক্ষ্মীর সেবা করিয়া সেই পথেই বা কতদূর অগ্রসর হওয়া যায়। স্বাধীন ব্যবসায়ের চরম ফল যাহা সে সকল উজ্জ্বল চিত্রই কল্পনার চক্ষে দেখিতে লাগিলাম, ভাবিলাম তাই ত, চাকরী করিয়া কখনও বড়লোক হইতে পারিব না। লেখা পড়া শিখিয়াছি এখন সৎপথে থাকিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় করিলে অবশ্যই সংসারে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিব। বড়ই বা হইব না কেন? এবং হইতে কত দিনই বা লাগিবে? বিদেশীয় মার্চ্চেণ্টদিগের মধ্যে কত কত বড় লোক দেখিতেছি। কিন্তু কল্পনা প্রসূত এই আদর্শ অবস্থাতে যাইয়া পঁহুছিবার পূর্ব্বে ছোট খাট এবং বৃহৎ কত যে বিঘ্ন বাধা ও কষ্ট যন্ত্রণা রহিয়াছে, তাহা অপরিনামদর্শী ও অনভিজ্ঞ যুবকের চিন্তাতে আইসে না, কখন আসিলেও দাঁড়াইবার স্থান পায় না, সুখস্বপ্ন আসিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়।

তখন কোন ভদ্র সন্তান দোকানদারী করিতে সাহস করিত না, তাহা করিলে সমাজে নিতান্ত ঘৃণিত ও অপদস্থ হইতে হইত। কিন্তু আমরা ব্রাহ্ম-স্পিরিটের লোক, আমরা বলিতাম কোন ব্যবসায়ই ছোট নহে, শুধু ছোট লোকের হাতে পড়িয়া রহিয়াছে বলিয়া ব্যবসায়গুলি এবং কাযগুলি ছোট ও হেয় হইয়া রহিয়াছে। আমরা ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলে তাহাতে আমরা ছোট হইয়া যাইব না বরং কাযগুলিই বড় হইয়া পড়িবে। এই সকল যুক্তি তর্ক দ্বারা মনকে প্রস্তুত করিলাম এবং দোকানদারী করিয়া সৎ সাহসের পরিচয় দিতে অগ্রসর হইলাম।

প্রথম ও প্রধান সমস্যা হইল মূলধনের অভাব। শিক্ষা সভ্যতা দ্বারা প্রস্তুত করা দেহ মন প্রাণ মাত্র সম্বল লইয়া সংসারে প্রবেশ করিয়াছি কিন্তু বাণিজ্য ব্যবসায় তো শুধু তদ্দারা চলে না,—মূলধনের প্রয়োজন। বাড়ী হইতে এ সম্বন্ধে কোন সাহায্য কি সহানুভূতি পাওয়া যাইবে না তাহা স্থির নিশ্চয় জানিতাম, কিন্তু আমাদের যে কিছু "কোটার মাটী"

আছে তাহা সহরেও প্রকাশ ছিল তাই লোন আপিসে ধার করিয়া টাকা পাওয়া গেল। সেখান হইতে এক সহস্র মুদ্রা ঋণ করিয়া, পুস্তক ও ষ্টেশনারীর এক দোকান খুলিলাম, তাহার নাম রাখিলাম "ঘোষ লাইব্রেরী।" কলিকাতা যাইয়া চালান আনা গেল, স্কুলের পাঠ্য ও অপাঠ্য পুস্তকাদির সঙ্গে কাগজ কলম পেন্সিল এবং দোকান চালাইবার উপযুক্ত চেয়ার টেবিল আলমারী ইত্যাদি সরঞ্জাম সকলই কেনা হইল। সহরে শিবদয়াল তেওয়ারীর বাড়ীতে ছোট একখানা দালান ভাড়া করিয়া তাহাতে 'ঘোষ লাইব্রেরী' স্থাপন করা গেল। নিকটেই বাবু শরচ্চন্দ্র রায়ের 'ব্রাহ্ম দোকান'। সে তো ছিল এক আনন্দকানন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ও ছাত্র সমাজের সম্মিলন স্থান, আমাদের দিন রাতের আড্ডা। কুচবিহারের বিবাহ উপলক্ষে আন্দোলন হইয়া যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হয় তখন যে প্রচারক মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ময়মনসিংহ আসিয়াছিলেন তাহা অন্য এক স্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে, এখন যাহা লিখিতেছি তাহা সেই সময়েরই কথা। দোকান খোলার তারিখে কতিপয় বন্ধুকে লইয়া সেখানে উপাসনা করা হইয়াছিল এবং উক্ত গোস্বামী মহাশয় সেই উপাসনার কাজ করিয়াছিলেন। কাঙ্গাল ফিকিরচান্দের সঙ্গীত "এত ভাল বাস থেকে আড়ালে" সবে মাত্র বাহির হইয়াছে ; ঐ উপাসনা উপলক্ষে সে সঙ্গীত গাহিয়া গাহিয়া আমরা একবারে বিভোর হইয়াছিলাম।

প্রথম প্রথম দোকান বেশ জাঁকিয়া উঠিল, ছাত্রগ্রাহক খুব যুটিয়া গেল এবং বিকি কিনিও তেমনি চলিল। মফঃস্বল হইতেও অর্ডার আসিতে লাগিল। তখন পুস্তক বিক্রয়ের কোন দোকান সহরে ছিল না ; কেবলমাত্র স্কুল-বুক-সোসাইটীর এজেণ্ট জেলা স্কুলের মাষ্টার বাবু কালীকুমার গুহ মহাশয় সেই সোসাইটী হইতে আনাইয়া ছাত্রদিগের

পাঠ্য পুস্তক কতক কতক যোগাইতেন। সে সময়ে ঢাকা ময়মনসিং রেলওয়ে হয় নাই। কলিকাতা হইতে জিনিষপত্র আনান মহা হেঙ্গাম ছিল; একবারের চালান শেষ হইলে আর একবার আনাইতে ঢের দিন চলিয়া যাইত, সর্ব্বদা সকল জিনিষ প্রচুর পরিমাণে রাখা যাইত না। এদিকে বাড়ী ভাড়া করিয়া দোকান করা হইয়াছে, সেজন্য একজন সরকার ও এক খানসামা চাকর রাখা হইয়াছে, সুতরাং মেসে খাওয়া ছাড়িয়া এখন হইতে সেই লাইব্রেরীকেই বাসাবাড়ীতে পরিণত করা গেল। তারপর ক্রমে ক্রমে দেখা গেল দেশের আত্মীয় কি অনাত্মীয় যে সকল লোক পূর্ব্বে কার্য্যোপলক্ষে সহরে গেলে মুদি দোকানে বাসা করিয়া থাকিত, এখন তাহারা আমার বাসাতেই যাইয়া উপস্থিত হয়; আমিও তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারি না। দোকানে জিনিষপত্র বিক্রয় হয়, টাকাও আমদানী হয়, সুতরাং খরচ পত্র অনায়াসে চলিয়া যায়। এইরূপে কিছু কাল গেলে পর বুঝিতে পারিলাম দোকানের মূলধন ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, এককালে যে কল্পনা করিয়াছিলাম এই দোকানই আমার অবলম্বন হইবে, ইহাকে আশ্রয় করিয়া গবর্ণমেণ্ট সারভিসকে তুচ্ছ করিব এবং এখানে থাকিয়াই সংসারে প্রতিপত্তিশালী হইব, সেই সকল কল্পনার স্রোত মন্দিভূত হইয়া চলিল, কল্পনার সেই আপাত মনোরম চিত্র সকল ম্লান হইয়া আসিল; ভাবিয়া দেখিলাম "ঘোষ লাইব্রেরী" রক্ষা করা আমার পক্ষে সুকঠিন হইবে, সুতরাং চাকরী বই আর গত্যন্তর নাই, স্বাধীন ব্যবসায়ের ঝোঁক আবার দাসত্বের দিকেই প্রবাহিত হইল।

ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম সমাজের গণ্যমান্য সভ্যদিগের মধ্যে বাবু প্রসন্নকুমার বসুও একজন ছিলেন। তাঁহার বাড়ী ছিল ঢাকা পাড়জোয়ার মধ্যে টেখড়িয়া গ্রামে। তিনি পুলিস আপিসের হেডক্লার্ক হইতে পুলিস

ইনস্পেক্টার হইয়াছিলেন। ইনি একজন অমিতসাহসী তেজিয়ান, বলবান ও চরিত্রবান লোক ছিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিপত্তিও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ক্রোধ রিপুর আধিপত্য এড়াইতে না পারিয়া সময় সময় নিজেই ক্ষুব্ধ হইতেন, তথাপি ব্রাহ্ম সমাজে আসার দরুণ যে প্রভূত পরিমাণে সংযম শিক্ষা হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিয়া আনন্দপ্রকাশ করিতেন। জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু রত্নমণি গুপ্ত মহাশয়ের সহিত ইনস্পেক্টার প্রসন্ন বাবুর বন্ধুতা ছিল। ইহাঁরা উভয়েই হিন্দু সমাজভুক্ত ছিলেন অথচ ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতেন ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য যত্ন চেষ্টা করিতেন। রত্নমণি বাবু আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ছিলেন। আমি তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতাম,—এখনও করি, তিনিও সর্ব্বদা আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহাকে অভিভাবক জ্ঞানে আমি আমার অভাব আকাঙ্ক্ষাদি জানাইতাম এবং তাঁহার পরামর্শ শিরোধার্য্য করিয়া কাজ কর্ম্ম করিতাম। তিনি আমার অবস্থা জানিয়া প্রসন্নবাবুর সহিত আলাপ করিয়াছিলেন; তাহাতে প্রসন্ন বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন পুলিশ বিভাগে কায লইতে প্রস্তুত আছি কি না; দেখাইলেন সেই বিভাগের কাযে বেশ লম্বা লম্বা বেতন আছে এবং সততার সহিত কায করিতে পারিলে উন্নতি ও প্রতিপত্তিও যথেষ্ট আছে। আমি তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলাম।

সে সময়ে টি, জি, চার্লস সাহেব ছিলেন ময়মনসিংহের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। পুলিসে শিক্ষিত ও সৎলোক ঢোকাইবার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। আমার আশৈশব বন্ধু বাবু গিরিজাকান্ত বল আমাকে ক্লালেক্টরীতে রাখিয়া ২৫৲ বেতনে পুলিস আপিসের সেকেণ্ড ক্লার্ক হইয়া গিয়াছিলেন, চার্লস সাহেব তাঁহাকে ৫০৲ বেতনের সব ইনস্পেক্টার নিযুক্ত করিলেন। তাহার কিছুকাল পরেই আমি উক্ত

সাহেবের নিকট যাইয়া পুলিস ফোর্সে কাযের প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলাম, প্রসন্ন বাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সাহেব আমার সার্টিফিকেট সকল পড়িতেছেন এমন সময় প্রসন্ন বাবু বলিলেন 'I entertain a very high opinion of him.' ইহাতেই সাহেব বুঝিলেন তিনি আমার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। সাহেব আমাকে বলিলেন, আপাততঃ কোন কায উপস্থিত নাই, যখন হইবে তখন আমাকে সংবাদ দেওয়া যাইবে। আমি সাহেবকে সেলাম করিয়া বলিলাম যে আমি একবারে উমেদার নহি, আমার একটা চাকরী আছে সুতরাং অপেক্ষা করিতে পারি আর পুলিসে কায খালি হইতেও বড় বিলম্ব হয় না। তখন সাহেব হাসিয়া বলিলেন "বটে? পুলিসে খুব ঘন ঘন কাজ খালি হয় নাকি?" আমিও হাসিয়া বলিলাম "প্রায়ই তো তাহা দেখিয়া থাকি",—বলিয়া পুলিস আপিস হইতে বিদায় হইয়া আসিলাম। সেই দিবসেই সায়ংকালে ঘোষ লাইব্রেরীতে সংবাদ গেল যে পরদিন কাছারীতে আমাকে পুলিস আপিসে যাওয়ার জন্য পুলিস সাহেব বলিয়া পাঠাইয়াছেন। প্রসন্ন বাবুর কাছে যাইয়া জানিতে পারিলাম ফুলপুর ষ্টেসনের সব ইনস্পেক্টার- শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে তাহার কোন অপরাধে হেড কনেষ্টবলীতে ডিগ্রেড করা হইয়াছে এবং সেই সব-ইনস্পেক্টারের পদ খালী হওয়াতে আমাকে সে পদে নিযুক্ত করার সম্ভাবনা হইয়াছে। এত সত্বরে ও এমন সহজেই যে একটা উচ্চ বেতনের কায পাইতে পারিব সেরূপ আশা করিয়াছিলাম না কিন্তু দয়াল পিতার প্রসাদাৎ তাহা সম্ভবপর হইয়া পড়িল। এখন থানার দারোগাগিরী লইব কি না তাহা বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিলাম। আমাদের মধ্যে বাবু শ্রীনাথ চন্দ ছাত্রজীবন হইতেই সদ্বিবেচক লোক বলিয়া খ্যাত, বিশেষতঃ আমার পক্ষে তিনি ধর্ম্মজগতে পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও উপদেষ্টা এবং সাংসারিক কায কর্ম্মে সর্ব্বদাই পরম হিতৈষী পরামর্শ

দাতা। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া চাকরী লওয়াই স্থির করা গেল কিন্তু একবারেই থানার দারোগা হইয়া পাকা পুলিস না সাজিয়া প্রথমতঃ কিছুকাল কোর্ট-সব-ইনস্পেক্টার হইয়া আমলাগিরী করা যায় কি না তাহারই চেষ্টা দেখা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইল। প্রসন্ন বাবুকে তাহা জানাইলাম, তিনি অমনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন "Yes, just go and make such suggestion to the D. S. P. and mar your prospects for ever. কেন? থানায়ই বা ভয়ের কারণ কি? সেখানে হেড কনেষ্টবেল ও রাইটার রহিয়াছে তাহারা কায কর্ম্মে সহায়তা করিবে ইত্যাদি"। আমি অবনত মস্তকে সকল শুনিলাম, কোন প্রতিবাদ করিলাম না, আপিসে যাইয়া উপস্থিত হইব বলিয়া চলিয়া আসিলাম। যথাসময়ে কালেক্টরীতে যাইয়া আপন আপিসের কায কর্ম্ম সারিয়া পুলিস আপিসে গেলাম। যাইয়া দেখি শ্রীযুক্ত চার্লস সাহেব ও প্রসন্ন বাবু এজলাসে বসিয়া আছেন। আমি সাহেবকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইবা মাত্র তিনি হাসিয়া বলিলেন "Well, you said yesterday that vacancies in the police were not very rare and so it happened" তখনই একখানা কাগজ টানিয়া লিখিলেন—

Babu Kalikrishna Ghosh is appointed a 4th grade S. I. in the place of S. I. Shib Chandra Bhattacharya degraded, and is posted to Jamalpur Court vice S. I. Prasanna Chandra Chaudhury transferred to Phulpur station.

ইহা দেখিয়া পুলিস আপিসের হেডক্লার্ক বাবু একবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং ছুটাছুটি করিয়া সার্কুলার ইত্যাদি আনিয়া সাহেবকে দেখাইতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে এরূপ হইতে পারে না,

ডিপার্টমেণ্টের লোক ছাড়া বাহিরের একজনকে এমন এক চোটে সব-ইনস্পেক্টরী দেওয়া যাইতে পারে না। সার্কুলারে দেখা গেল ইনস্পেক্টার জেনেরেলের নিকট পরীক্ষা দিয়া পাশ করিতে পারিলে বাহিরের লোকেও সব ইনস্পেক্টারের পদে নিযুক্ত হইতে পারে। তখন সাহেব বলিলেন "কুচ পরওয়া নেই He will pass this examination" সে দিনের ব্যাপার এখানেই শেষ হইল।

এখন তো সহর ছাড়িয়া মফঃস্বলে যাইতে হইবে, সুতরাং ঘোষ লাইব্রেরীর দোকানপাট wind up—বন্ধ করিতে হয়। নিকাশ করিয়া দেখিলাম আমার ৫০০৲ টাকা ঋণ দাঁড়াইল। অন্য কোন শরিক ছিল না, লাভ লোকসান যাহা কিছু নিজেরই হইয়াছে, অপর কাহারো সহিত কলহ বিবাদ বা মনোমালিন্যের কারণ নাই। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ ও পরম হিতৈষী শিক্ষক ও অভিভাবক সেই রত্নমণি গুপ্ত মহাশয় আমাকে ৫০০৲ টাকা ধার দিলেন, আমি তদ্দ্বারা দোকানের ঋণ পরিশোধ করিয়া জামালপুরে চলিয়া গেলাম পরে ক্রমে ক্রমে কয়েক বৎসরে সেই ৫০০৲ টাকা পরিশোধ করিয়াছিলাম।

জামালপুর কোর্টে যাইয়া দুই মাস কাজ করিতে না করিতেই কলিকাতা হইতে পুলিসের ডিপুটী ইনস্পেক্টার জেনেরেল সাহেব পরিদর্শন উপলক্ষে ময়মনসিং আসিলেন। আমি তাঁহার কাছে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। আমার সব ইনস্পেক্টারী বাহালই রহিল, হেডক্লার্ক মহাশয় আর কিছু করিতে পারিলেন না। তারপর দেখা হইলেই হাসিয়া হাসিয়া হাত বাড়াইয়া দিয়া হ্যাণ্ডসেক্ করিতেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১৮৮১ সন—এ সময়ে জামালপুরের নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। অধিকাংশ যুবক এবং প্রাচীনদেরও অনেকেই চরিত্রহীন। দুর্নীতির প্রভাব সেখানে এতই প্রবল ছিল যে স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র পর্য্যন্ত সে হাওয়াতে কলুষিত না হইয়া থাকিতে পারিত না।

জামালপুর।

বাবু মন্মথনাথ মুখার্জ্জি নামে এক ব্যক্তি এই সময়ে সেখানে মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া প্রকাশ করিলেন যে তিনি যে স্থান হইতে আসিয়াছেন সেখানে ব্রাহ্মসমাজ রহিয়াছে, তিনি সেই সমাজের সভ্য ছিলেন। জামালপুরে একটা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করার জন্য তিনি নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে উৎসাহ দিতে পারে, বিধাতা এরূপ লোক জামালপুরেও আনিয়া মিলাইলেন দেখিয়া আমি নিতান্ত আহ্লাদিত হইলাম এবং উক্ত মুন্সেফ বাবু ও আরো কয়েকটি যুবককে লইয়া এক প্রার্থনা সমাজ স্থাপন পূর্ব্বক আমরা তাহাতে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা করিতে লাগিলাম। যুবকদিগের মধ্যে শ্রীমান্ বরদাকান্ত রায়, রাইমোহন ঘোষ ও আনন্দমোহন ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। আমরা জামালপুর পোষ্ট আপিসের নিকটে এক খণ্ড ভূমির উপরে ছোট একখানা উপাসনা মন্দির প্রস্তুত করিলাম। তাহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়কে আমরা ময়মনসিংহ হইতে আহ্বান করিয়া জামালপুরে আনিয়াছিলাম। তাঁহার সঙ্গে ময়মনসিংহ হইতে বাবু শ্রীনাথ চন্দ প্রভৃতি কতিপয় উৎসাহী যুবক ব্রাহ্ম তথায় গিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই একটি নগর সংকীর্ত্তন গাহিয়া গাহিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম। প্রচারক

মহাশয় সহ ময়মনসিংহের বন্ধুগণ গেলে পর তাঁহাদিগকে লইয়া জামালপুরের রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইয়া সেই নগরসঙ্কীর্ত্তন গাহিয়াছিলাম, তাহাতে জামালপুরের অধিবাসী ও প্রবাসী অনেক লোক আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। মন্দিরে বক্তৃতা উপাসনা সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন সম্বলিত উৎসব হইয়াছিল।

জামালপুরে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুত্থান ও তাহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া স্থানীয় হিন্দুসমাজ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। বাবু হরিচরণ গুহ উকীল তাহার নেতা হইয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাদের কাজে পদে পদে বিঘ্ন বাধা উপস্থিত করিতে লাগিলেন। তিনি এবং তাহার দলের কতিপয় অর্ব্বাচীন লোক মনে করিলেন যে হিন্দুসমাজ বুঝি আর টিকে না। তাহা যেন একেবারে 'যায়' 'যায়' অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। যেদিন আমাদের মন্দির প্রবেশ উপলক্ষে উপাসনা উৎসব ও প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বক্তৃতাদি হইয়াছিল সেই দিন গুহ মহাশয় স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে কিছু ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন। সেরপুর হইতে পণ্ডিত হরসুন্দর তর্করত্ন মহাশয়কে আনিয়া তাহার দ্বারা পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করাইলেন, বক্তৃতা দেওয়াইলেন। এ সকল তো বেশ উত্তম কাজই বটে, তর্করত্ন মহাশয় একজন অতি উচ্চ শ্রেণীর পণ্ডিত ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, নানা শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারও তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। তাদৃশ পণ্ডিত লোক দ্বারা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করান এবং ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া বেশ উৎকৃষ্ট কার্য্য তাহাতে সন্দেহ কি? আমাদের ব্রাহ্ম সমাজে একটুকু আন্দোলন ও কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া হিন্দুসমাজে ঐরূপ জাগরণ ও সৎকাজের চেষ্টা হইল বলিয়া আমরাই শ্লাঘা অনুভব করিতে পারি, যদি তাহা বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রণোদিত না হয়। আমাদের নির্দ্ধারিত দিবসের দুই এক দিন পূর্ব্বে

বা পরে তর্করত্ন মহাশয়কে আনাইয়া দুর্গাবাড়ীর অনুষ্ঠান করিলে জামালপুরের সকল লোক সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বক্তৃতা এবং দুর্গাবাড়ীতে যাইয়া তর্করত্ন মহাশয়ের আলোচনা ও উপদেশ শুনিতে পারিত। কিন্তু ভীতি-সঙ্কুচিত হৃদয়ে তো সে উদার ভাবের অভ্যুদয় হয় না!

পাছে ব্রাহ্মসমাজের এক বক্তৃতা শুনিয়াই সকল লোক ব্রাহ্ম হইয়া যায়! তাহা হইলে হিন্দু সমাজ তো আর থাকে না। এরূপ ভয়ে যাহারা ভীত তাহারা প্রতিবাদ বা প্রতিযোগী সভা আহ্বান না করিয়া প্রতিবন্ধক সভারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমাদের উৎসবে ঢের লোক উপস্থিত হইয়াছিল; সেই ক্ষুদ্র মন্দির ও তাহার প্রাঙ্গন পূর্ণ করিয়া নিকটস্থ সড়কের উপরেও বহু লোক দণ্ডায়মান ছিল। বাবু শ্রীনাথ চন্দের কোমল কণ্ঠের সুললিত সঙ্গীত এবং প্রচারক বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গভীর জ্ঞানপূর্ণ উপদেশে সকল লোক মুগ্ধ হইয়াছিল। রামকুমার বাবুর বক্তৃতার মধ্যভাগে দুর্গাবাড়ীর প্রেরিত সঙ্কীর্ত্তনের দল আমাদের মন্দিরের সম্মুখে সড়কে দাঁড়াইয়া অকারণে খোল করতাল ও কাঁশী কাশর বাজাইয়া খুব গোলমাল করিয়াছিল কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহাতে তাঁহার বক্তৃতা বন্ধ না করিয়া আরো দ্বিগুণতর উচ্চৈঃস্বরে ও মহাতেজে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। শ্রোতৃবর্গ কীর্ত্তনের দলের ব্যবহারে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। এ সম্বন্ধে পরে সহরে যে সব সমালোচনা হয় তাহা গুহ মহাশয়ের পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিকর হইয়াছিল। সবডিভিসনেল অফিসার মিঃ ডনো সাহেব শুনিয়া বলিয়াছিলেন—

Why did you not send them to Hajat ?

আমাদের উৎসবাদি কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিয়া প্রচারক প্রভৃতিকে

বিদায় করিয়া দিলাম কিন্তু তাহার পর হইতে যে সামাজিক উৎপীড়ন আরম্ভ হইল তাহাতে আমাদিগকে কিছু বেগ পাইতে হইয়াছিল।

জামালপুরের মত স্থানে এত শীঘ্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের চেষ্টা কখনই করিতাম না; কেবল একমাত্র নবাগত মুন্সেফ বাবুর উৎসাহে ও উত্তেজনাতেই তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এখন গুহমহাশয় সেই মুন্সেফ বাবুকে এমনি ভাবে ধরিলেন যে তিনি আমাদের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন। আমাদের সংখ্যা কমিতে কমিতে আর অধিক বাকী রহিল না। এই তো গেল উপাসক সম্প্রদায়ের অবস্থা। তারপর তাহারা যে-সকল বাসায় থাকে ও সেই সকল বাসার সহিত অপর যে সব ভদ্র লোকের সদ্ভাব আছে সেই সকল বাসার পুরোহিত বন্ধ করা হইল। জামালপুবে যে-সব যাজনিক ব্রাহ্মণের বাস তাহারা সকলেই গৌরীপুর ও রামগোপালপুরের জমিদারের প্রজা, উকীল মহাশয়েরা জমিদারী কাছারীর আমলাদিগকে বাধ্য করিয়া তাহাদের দ্বারা পুরোহিতদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন যে ব্রাহ্মদের সঙ্গে যাহারা আহারাদি করে তাহাদের বাসায় যাইয়া কোন পূজা অর্চ্চনা ব্রতাদি করিতে পারিবে না। বিষম বিপদে পড়া গেল! অনেকে আসিয়া বলিলেন "আর তো তোমাদের সঙ্গে থাকা যায় না। আমরা জানি যে তোমরা কোন অপকায করিতেছ না, সুতরাং তোমাদিগকে সমাজের বাহির করিয়া দেওয়া অন্যায়, কিন্তু কি করি? আমাদের নিত্তনৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ড, মেয়েদের ব্রত নিয়মাদি রক্ষা করার জন্য যদি পুরোহিত পাওয়া না যায় তবে কেমন করিয়া তোমাদিগকে লইয়া থাকিব?"

ইঁহাদের মধ্যে বাবু তারকচন্দ্র বসুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখাপড়া অতি সামান্যই জানিতেন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন সমাজেরই বড় ধার ধারিতেন না কিন্তু বড় জেদবাজ সাহসী ও উচিতবক্তা লোক

ছিলেন; কাহাকেও কোন অন্যায় কাজ করিতে দেখিলে সিংহ বিক্রমে গর্জ্জিয়া উঠিতেন। আবকারীর মোহরেরী কার্য্য করিতেন অথচ সেরেস্তাদার বা ডেপুটীর সঙ্গেও বিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না! এই তারক বাবু আমাদের খুব পক্ষ সমর্থন করিতেন। তিনি বলিতেন "আমি দেখিতেছি অহরহ যাহারা মুসলমান বাবুর্চ্চির পাক করা মোরগের মাংস খাইতেছে অথবা যাহারা শুঁড়ীর দোকানে বা বেশ্যালয়ে আহারাদি করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না, হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে কিছু বলিতে সাহস করে না, অথচ তোমরা ঈশ্বরের নাম লইবার জন্য একটা সভা করিয়াছ সেই অপরাধে ব্যাটারা তোমাদিগকে জাতিচ্যুত করিতে চায়, আমি তাহা কখনই হইতে দিব না। তোমরা জাতিভেদ মানিয়া চল, দেখি কে কি করিতে পারে?" তারক বাবু ধমকাইয়া অনেককে আমাদের দলে রাখিয়া দিতেন। শুধু তাহাই নহে, অনেকে মুখেমুখে একরূপ বলিয়া কার্য্যকালে অন্যরূপ করে, সে জন্য তিনি আপন খরচে নিজের বাসায় খাওয়ার আয়োজন করিয়া সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া বসিতেন এবং তাহাতে কে খাইতে আসে এবং কে না আসে তাহা দেখিতেন। এই পুরোহিত বিভ্রাট সম্বন্ধে ময়মনসিংহ নগরে আমাদের পরম হিতৈষী ও শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক শ্রীযুক্ত রতনমণি গুপ্ত মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলাম। তিনি তথা হইতে দুইজন বিক্রমপুরী ব্রাহ্মণ জামালপুরে পাঠাইয়া দিলেন। আমরা তাহাদিগের দ্বারা আমাদের দলস্থ সকলের বাসায় বাসায় পৌরোহিত্য কার্য্যের বন্দোবস্ত করিলাম।

এই উপলক্ষে যেমন সময় সময় নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় পতিত হইতে হইত সেইরূপ অনেক সময়েই আবার অনেক আমোদজনক ঘটনা ঘটিত। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে সকলের বাসায় বাসায় মনসা পূজা হইল। তখন কালেক্টরীর নাজীর বাবু দীননাথ বিশ্বাস রেজেষ্টরী বিভাগের

হেড ক্লার্ক বাবু কুঞ্জ কিশোর মজুমদারকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন—“দেখিয়াছ? বিক্রমপুরী ব্রাহ্মণেরা যে আমাদের বাসায় বাসায় পূজা করাইয়াছে তাহার বেল পাতাগুলি সকল পুড়ানই হয় নাই—এ ত ভাল কথা নয়! কালীকৃষ্ণ বাবুকে একথা বলিতে হয়।” কুঞ্জবাবু অমনি দৌড়িয়া আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত। বলিলেন, “হাঁ মহাশয়, এ কেমন কথা? আমার বাসায় যজ্ঞের বেল পাতা সকল পোড়ান হয় নাই কেন?” আমি তাঁহাকে মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া আলাপ করিতে করিতে বুঝিতে পারিলাম যে নাজীর মহাশয় কেবল আমোদ করিবার জন্য ঠাট্টা তামাসাচ্ছলে কুঞ্জবাবুকে ঐরূপ বুঝাইয়াছিলেন। তাহাকে দেখাইয়া দেওয়া গেল প্রত্যেক বাড়ীতে যজ্ঞাহুতির বিল্বপত্র সকল সম্পূর্ণ দগ্ধ হয় না, অনেকটা অৰ্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় থাকে, কতকটা বা একেবারে অগ্নিকুণ্ডের বাহিরেই পড়িয়া থাকে। তাহাতে কাহারও কোন দোষ হয় না এবং তাহা লইয়া কেহ কোনও আন্দোলন করে না। তখন কুঞ্জ বাবু নাজীর বাবুর চালাকী বুঝিতে পারিলেন। উভয়ে মিলিয়া দীনু বাবুর বাসায় গেলেন, তারকবাবুও সেখানে যাইয়া যুটিলেন, হাসা হাসির খুব রগড় উঠিল এবং এইরূপে মনশা যজ্ঞের পূর্ণাহুতি শেষ করা গেল।

সবডিভিসনেল অফিসার মিঃ ডনো সাহেবের পুত্র Walter Donough সেই সময়ে বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এদেশে আইসেন এবং প্রথমেই তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া জামালপুরে কিছুকাল অবস্থান করেন।

আমরা তাঁহার উপলক্ষে স্কুলঘরে একটা Evening Party করিয়াছিলাম। স্থানীয় সকল শ্রেণীর ভদ্র লোকই তাহাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে জলযোগের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। কবিতা পাঠ বক্তৃতা ও কনসার্ট প্রভৃতি আমোদ ছিল; সাহেবদ্বয় (পিতা পুত্র দুজনেই)

অতিশয় প্রীত ও আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে ময়মনসিংহ নগরে ডিষ্ট্রীক্ট জজ মিঃ কার্ক উড্ (Kirkwood) সাহেবের ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল এবং তদুপলক্ষে উক্ত জজ সাহেব তাঁহার কোর্টের বাঙ্গালী ভদ্র লোকদিগকে এক ভোজ দিয়াছিলেন। ডনো সাহেব আমার কাছে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন—তিনিও জামাল-পুরের ভদ্রলোকদিগকে সেইরূপ এক ভোজ দিতে চান, আমি তাহার সুনির্ব্বাহের ভার নিলেই হইতে পারে। আমি আহ্লাদের সহিত সে ভার গ্রহণ করিলাম এবং স্থানীয় ভদ্রলোক সকলকেই সাহেবের সদভিপ্রায় জানাইলাম। এষ্টিমেট করিয়া সাহেব হইতে টাকা লওয়া হইল এবং খাসী পাঁঠা ঘৃত ইত্যাদি খরিদ করা হইল কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সে খাওয়া ঘটিল না। সেই দলাদলীর তর্ক উপস্থিত হইল। কেহ বলিলেন, সকলের একঘরে এক পংক্তিতে বসিয়া খাওয়া হইবে না, কেহ বলিলেন 'যে-ব্রাহ্মণ আমাদের পরিবেশন করিবে সে তাহাদের পরিবেশন করিতে পারিবে না',—কেহ বলিল 'আমাদের পরিবেশন আগে করিতে হইবে' ইত্যাদি। দেখিলাম সাহেবের এই নিমন্ত্রণ খাওয়া উপলক্ষে যে সুখ যে আমোদ হইবে বলিয়া প্রত্যাশা ছিল তাহা হইবে না সুতরাং ইহা রহিত করাই ভাল। তখন মুসলমানদিগের খাওয়ার আয়োজন করিয়া দেওয়া গেল ও তাহাদের খাওয়া হইয়া গেল এবং হিন্দুদিগের খাওয়ার টাকা নিয়া সাহেবকে ফিরাইয়া দিলাম।

ভাবিয়া দেখিলাম জামালপুরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের অনুষ্ঠান স্থানীয় অবস্থানুসারে নিতান্ত Premature অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ের অনেকটা পূর্ব্বে হইয়া পড়িয়াছে। আগে তদুপযোগী লোক প্রস্তুত করিয়া পরে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া যায় এবং সে কাজ স্থায়ী হয়। আমার উদ্দেশ্যও সেইরূপই ছিল, কেবল ঐ অর্ব্বাচীন ও অব্যবস্থিত

চিত্ত মুনসেফটীর দরুণ অন্যরূপ হইয়া পড়িল। সেই প্রলোভনপূর্ণ স্থানের তরলমতি যুবকদিগকে প্রথমেই ধর্ম্মের কঠোর উপদেশ দ্বারা সুনীতি ও সংযমের পথে আকৃষ্ট করা সুবিধাজনক হইবেনা। কুৎসিৎ স্থানের কলুষিত আমোদের পরিবর্ত্তে যদি এমন কোনও স্থান প্রস্তুত করা যায়, যেখানে ভদ্রসমাগমে সম্মিলিত হইয়া বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ করিবার সুযোগ হয়, তাহা হইলে যুবকের দল অবশ্যই সেস্থানে আকৃষ্ট হইবে। এইরূপ আলোচনা করিয়া জামালপুরে একটা পাব্লিক লাইব্রেরী ও রিডিংরুম (সাধারণ পাঠাগার) স্থাপনের সংকল্প করিলাম। সব-ডিভিসনেল অফিসার শ্রীযুক্ত ডনো সাহেব সমীপে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন—"Where shall you get a reading public at Jamalpur?" আমি বলিলাম—" I shall create such public here." তিনি এসম্বন্ধে চিঠিপত্র স্বাক্ষর করিতে আর কোন আপত্তি করিলেন না। অবিলম্বেই চাঁদা করিয়া দানের কতক টাকা সংগ্রহ করা গেল এবং কয়েকখানা নভেল নাটক প্রভৃতি light literature পুস্তক আনান হইল। টেবিল, চেয়ার, আলমারী ইত্যাদি প্রয়োজনীয় Furniture আস্‌বাবপত্র সকল সংগৃহীত হইলে ব্রাহ্মসমাজের জন্য যে বাঙ্গলা ঘর উঠান গিয়াছিল, তাহাতেই লাইব্রেরী ও রিডিং রুম স্থাপিত হইবে এবং সেখানেই প্রত্যহ অপরাহ্ণে ভদ্রসন্তানেরা মিলিত হইয়া আমোদজনক নানাপ্রকার বই পড়িবে ও গল্প করিবে, এবং সেইখানেই ক্রমে ক্রমে যুবকদিগের চরিত্র গঠিত হইবে, এইরূপে স্থির করিয়া আপাততঃ বইগুলি স্কুল লাইব্রেরীতেই রাখা গেল। স্থানীয় উকীল দিগের মধ্যে বাবু রামরতন দে একজন সাহসী চরিত্রবান্ এবং তেজস্বী লোক ছিলেন। আমি সকল কাজে তাঁহার সহানুভূতি ও উৎসাহ পাইতাম। রামরতন বাবু অধ্যবসায় গুণে প্রভূত অর্থবিত্ত ও সম্মান অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন,

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উচ্চ শিক্ষা দান ও সদ্বংশে বিবাহ করাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র এখন বিদ্যাশিক্ষার্থে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছে। সাধুতা ও সততাপূর্ণ উৎসাহ উদ্যম ও সাহসের পুরস্কার কি সুন্দর, কি প্রীতিপদ তাহা বন্ধুবর রায়রতনবাবুর জীবনে এবং জামালপুর বারের অন্যতম উকীল শ্রদ্ধেয় গোবিন্দ প্রসাদ নিয়োগী মহাশয়ের জীবনে অনেকেই দেখিতে পাইয়াছেন। নিয়োগী মহাশয় প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সাধারণের উপকারজনক যে কাজেই প্রবৃত্ত করা গিয়াছে, তাহাতে বালকের ন্যায় উৎসাহ উদ্দমে খাটিয়াছেন। ঈশ্বর কৃপায় তাঁহার পুত্রগণ উচ্চশিক্ষা ও সচ্চরিত্র লাভ করিয়া প্রতিপত্তি ও সম্মানের সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

এস্থলে Mr. T. A. Donough, Sub-Divisional Officer সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। দূরে থাকিতে তাঁহার অনেক নিন্দাবাদ শুনিতাম, তাই তাঁহার কোর্টে কাজ লইয়া যাওয়া কালে নিতান্ত ভীতচিত্তে গিয়াছিলাম, কিন্তু কাছে যাইয়া দেখিলাম তাঁহার গুণরাশির সীমা নাই। অবশ্য মনুষ্য মাত্রেরই একটা দুইটা দোষ থাকে ; ডনো সাহেবও দোষ শূন্য ছিলেন না ; কিন্তু তাঁহার যে-সকল গুণ ছিল, সাহেব ও বাঙ্গালী হাকিমের মধ্যে তদ্রূপ গুণশালী লোক অল্পই দেখিয়াছি ; তিনি একজন সুলেখক, উৎকৃষ্ট চিত্রকর এবং কবি ছিলেন। সৌন্দর্য্যানুরাগ তাঁহার এমনি প্রবল ছিল যে যেখানে যাহা সুন্দর দেখিয়াছেন, সেখানে তাহা ভালবাসিয়া তাহার যত্ন করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিতেন। তিনি নিজহাতে যে সকল ছবি আঁকিয়াছেন, তেমন উৎকৃষ্ট ছবি বাজারে সচরাচর কিনিতে পাওয়া যায় না।

পারস্য ভাষায় তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। বহুদিন এ দেশে থাকিয়া বাঙ্গলা ভাষাও খুব ভালই শিখিয়াছিলেন, এবং বাঙ্গালীর সঙ্গে মেশা

মিশি করিয়া আমাদের রীতি নীতি ও চাল চলন সকলই বুঝিয়াছিলেন। ভদ্রলোকের প্রতি তাঁহার ভদ্রতা ও সদ্ব্যবহার অতীব প্রশংসনীয় ছিল, কিন্তু দুষ্টলোকের কঠোর শাস্তি বিধান করিতেন। তাঁহার দোষের মধ্যে প্রধান দোষ এই ছিল যে যাহাকে তিনি ভালবাসিতেন, একবার যে তাঁহার সুনজরে পড়িত, তাহার সম্বন্ধে এককালে অন্ধ হইয়া যাইতেন; সে ব্যক্তির মধ্যে ভাল যাহা তাহার একগুণকে শতগুণ করিয়া লইতেন; কিন্তু মন্দ শতগুণ থাকিলেও তাহা দেখিতেন না। ভালবাসার দাস হইলে এরূপ অন্ধ কেই বা না হয়? আমি দেখিলাম পন্থা দেখাইয়া দিলে তাঁহার দ্বারা অনেক সৎকাজ করাইয়া লওয়া যায়। ডনো সাহেব ১৮৬৮ সালে জামালপুর মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইয়া যান, আর ১৮৮২ সালে সেখান হইতে পেন্সন লইয়া তবে সেস্থান ছাড়েন। এই সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া তিনি জামালপুরে একাধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে সৎপরামর্শ দিয়া চালাইবার জন্য তেমন পরোপকারী ও সদাশয় লোক কাছে থাকিলে, এই কাল মধ্যে জামালপুর সবডিভিশনের অনেক কাজই উদ্ধার করিয়া লওয়া যাইত।

আমার অনুষ্ঠিত লাইব্রেরী ও রিডিং রুমের কাজ সম্পন্ন করার পূর্ব্বেই আমাকে জামালপুর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে জামালপুর মাইনর (Middle class) স্কুলকে Donough School নাম দিয়া এণ্ট্রান্স স্কুলে উন্নীত করা হয়। তাহার প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিলেন বাবু হৃদয়কৃষ্ণ মজুমদার। এ বিষয়েও ডনো সাহেব প্রথমে আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন "মাইনর স্কুলের চাঁদাই বাবুদের নিকট আদায় হয় না, তোমরা এণ্ট্রান্স স্কুল কি করিয়া চালাইবে?" কিন্তু হৃদয় বাবুর চেষ্টায় সাহেবের সে আপত্তি খণ্ডন করিয়া স্কুলের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা গেল।

ষ্টেটুটারী সিভিল সার্ভিস্ যথন প্রবর্ত্তিত হয় তাহার প্রথম পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু। এই সময়ে তিনি জামালপুরের সব-ডিভিসনেল অফিসার হইয়া আসিয়াছিলেন। যে কোন বিষয়ের নূতন প্রবর্ত্তকদিগের পদে পদে সমস্যা কত! তথন বিলাত-ফেরত ব্যতীত বাঙ্গালী বাবুদের মধ্যে সাহেবদিগের ন্যায় হ্যাট কোট ও নেকটাই ব্যাবহার করার নীতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আবার চোগা চাপকান ও সামলা ব্যবহার করিলে ডেপুটীদিগের সহিত আর পার্থক্য রহিল কৈ? সুতরাং প্রথমতঃ এই পরিচ্ছদ সম্বন্ধেই সেই পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবককে ডিপুটী ও সিভিলিয়ানদের মধ্যে Intermediate একটা কিছু করিয়া লইতে হইবে। আমরা দেখিতাম নন্দকৃষ্ণ বাবু লম্বা পার্সী কোট ও কেপ ব্যবহার করিতেন। কিছুকাল পরে ষ্টেটুটারীগণও বিলাতী সিভিলিয়ানের পোষাকই ধারণ করিলেন। কিন্তু বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল বগুড়ার ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট হইয়াও চোগা চাপকানই ব্যবহার করিয়াছিলেন। নন্দকৃষ্ণ বাবু দস্তথৎ করিতেন N. K. Bose, সরকারী চিঠি পত্রে লিখিতেন From N. K. Bose Esqr. জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট R. M. Waller সাহেব তাহাতে আপত্তি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ বিষয়ে তিনি ডেপুটীদের প্রথা অবলম্বন না করিয়া সাহেবী ধরণ ধরিলেন কেন? নন্দকৃষ্ণ বাবু তথন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন কিন্তু তথাপি বিলাতী সিভিলিয়ান মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে চিঠি পত্র লেথার এটিকেট মধ্যেও সমকক্ষতা দেখাইতে দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। Mr. Bose তাহাতে বাঙ্গলার লেফেটেনেণ্ট গবর্ণরকে চিঠি লিখিলেন এবং এ সম্বন্ধে একটা অর্ডার প্রচার করিতে অনুরোধ করিলেন। Waller সাহেব হারিয়া গেলেন, নন্দকৃষ্ণ বাবুরই জয় হইল।

বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু ও জামালপুর মেলা—১৮৮৪।

এই সময়ে কৃষিপ্রদর্শনীর হুজুগ উঠিয়াছিল। ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতির কৃষিপ্রদর্শনীর অনুকরণে কিশোরগঞ্জ এবং নেত্রকোণা সব-ডিভিসনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রদর্শনী হইয়াছিল।

সবডিভিসনের জমিদার তালুকদার ও অবস্থাপন্ন লোকদিগের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শন ও পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং গান বাদ্য নাট্যাভিনয় ও বাজী পোড়ান ইত্যাদি আমোদ যোগাইয়া এলাকার প্রজাদিগকে পরিতৃপ্ত করা হয়।

কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা সবডিভিসনে ঐরূপ হইয়া গেলে পর বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু জামালপুরে কৃষিপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিলেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে জিনিষ পত্র ক্রয় বিক্রয়ের এক মেলা বসাইলেন। মাসাধিক কাল ব্যাপিয়া সেই মেলার কার্য্য চলিল এবং তাহাতে স্থানীয় ও নিকট-বর্ত্তী সহর বন্দরের বড় বড় দোকানীরা নানা প্রকারের দ্রব্য সম্ভার আনিয়া ক্রয়বিক্রয় করিতে লাগিল। এই মেলাদ্বারা যে নন্দকৃষ্ণ বাবুর এক অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপিত হইবে এবং তদ্দ্বারা এই দেশের প্রভূত উপকার সংসাধিত হইবে তাহা কেহ কোন দিন স্বপ্নেও ভাবে নাই, কিন্তু বিধাতার অভাবনীয় কৃপাবলে তাহা সংঘটিত হইল।

দিনাজপুর ও রঙ্গপুর জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘোড়া গরু প্রভৃতি পশু বিক্রয়ের মেলা বসিয়া থাকে এবং তাহাতে দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থান হইতে নানা প্রকার গরুর আমদানী হইয়া থাকে। পাইকারেরা দলে দলে যাইয়া ঐ সকল গরু আনিয়া এই দেশের ভিন্ন ভিন্ন হাটে বন্দরে বৎসর বৎসর বিক্রী করে। ঐ সকল গরু জামালপুরের মেলায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শতে শতে হাজারে হাজারে বিক্রয় হইতে লাগিল। সুতরাং দেখিতে দেখিতে ৭।৮ হাজার টাকা মেলা ফণ্ডের আয় হইয়া পড়িল। এইরূপ প্রতি বৎসর হইতেছে। এখন

জামালপুরের মেলা বার্ষিক ৮।১০ হাজার টাকা আয়ের একটা স্থায়ী সম্পত্তি। দেশের কি সৌভাগ্য! এই মেলা ফণ্ড্ দ্বারা স্থানীয় ও দূরদেশস্থ বহুতর হিতকর কার্য্যের সাহায্য চলিতেছে। স্থানীয় হাই স্কুল, গের্ল্ স্কুল, মাদ্রাশা, ডাক্তারখানা, দুর্গা বাড়ী, মস্‌জিদ প্রভৃতি সাধারণের উপকারজনক যাহা কিছু আছে তাহার প্রত্যেকটাতেই মেলা ফণ্ড হইতে যথেষ্ট সাহায্য করা হয়। কোন দুর্ঘটনা উপলক্ষে কোন দূরতম দেশে অর্থ প্রেরণের প্রয়োজন হইলে তাহা পাঠান হইয়া থাকে। তা ছাড়া কত ভিক্ষুক ও দায়গ্রস্থ ব্যক্তি জামালপুরে যাইয়া এই মেলাফণ্ড হইতে সাহায্য লইয়া উদ্ধার পাইয়া যায়।

এক সময়ে এই মেলাটাকে গভর্ণমেণ্ট প্রপার্টি করিয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল, তাহাতে পবলিকের সহিত গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের ঝগড়া বিবাদ ও মামলা মোকদ্দমা খুবই হইয়াছিল কিন্তু তাহাতেও মেলা বিনষ্ট হয় নাই। দেশের সৌভাগ্য ক্রমে মেলা সর্ব্বসাধারণের—পবলিক প্রপার্টিই রহিয়া গিয়াছে। তাই জামালপুর মেলার সঙ্গে সঙ্গে বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সেরপুর
১৮৮৫ সাল

সেরপুর পুলিশ ষ্টেশন তখন টাউনের বাহিরে মৃগী নদীর পাড়ে অবস্থিত ছিল। স্ফটিক স্বচ্ছ শীতল জলে মৃগী নদী বারো মাস পূর্ণ থাকে, তাহার উপরেই পুলিশের থানা; দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক হইতে বায়ু সঞ্চরণের সুবিধাও যথেষ্ট, তথাপি সে স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরের এতই উপদ্রব যে সেখানে যাইয়া কেহই তিষ্ঠিতে চায় না। অথচ সহর সেরপুর স্থানে স্থানে নিতান্ত অপরিষ্কার ও জঙ্গলাকীর্ণ, তথাপি জ্বরের প্রাদুর্ভাব সেখানে অনেক কম। এই নিমিত্তই ইদানিং পুলিশ ষ্টেসন সেখান হইতে সরাইয়া সহরের দক্ষিণ প্রান্তে আনা হইয়াছে। তখন কার্য্যোপলক্ষে থানা হইতে বাহির হইয়া

মফঃস্বলে যাইতে পারিলেই থাকা যাইত ভাল, নতুবা বাসায় পড়িয়া শুধু কম্প জ্বরে ভুগিতে হইত আর রাত্রিকালে ঘরের পিছনেই ব্যাঘ্রগর্জ্জন শোনা যাইত। প্রথম প্রথম ঘরের কাছেই বাঘের ডাক শুনিয়া বড় ভয় হইত কিন্তু যখন দেখা গেল তাহারা প্রায় সর্ব্বদাই রাত্রিযোগে ঐ পথে যাতায়াত করে কিন্তু ঝাঁপ টাটী ভাঙ্গিয়া কোন ঘরে প্রবেশ করে না তখন মাঝে মাঝে ঐরূপ ডাক শুনিতে আমরা অভ্যস্থ হইয়া গেলাম।

সেরপুর সহরে শীতলপুর নামক স্থানে ॥/০ আনীর জমিদার বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের এক মনোহর উদ্যান ছিল। তিনি সেই বাগানে সুন্দর এক জলাশয়ের পাড়ে একখানি সুন্দর বাঙ্গলা উঠাইয়াছিলেন। সাহেব লোক সেরপুরে গেলে সেই বাঙ্গলায় যাইয়া ক্যাম্প করিত। লাউইস Lowis সাহেব সে কালে ঢাকা ডিভিসনের কমিসনার ছিলেন। ইনিই পরে রাজসাহী ডিভিসনের কমিসনার হইয়া দার্জ্জিলিং পাহাড়ে Lowis Sanitarium প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উক্ত কমিসনার সাহেব তাঁহার প্রধান আমলা বাবু নবীনচন্দ্র গুহ প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া সেরপুরে আসিয়াছিলেন এবং শীতল বাগানের বাঙ্গলায় অবস্থিতি করিয়া বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। Statutory Civilian Mr. N. K. Bose (বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু) তখন জামালপুরের সবডিভিসনেল অফিসার ছিলেন, তিনি জামালপুর হইতে এই ক্যাম্পে আসিতেন। আমরা কখনও বাঙ্গালাতে যাইয়া সাহেব বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম কখনও ॥/০ আনীর বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার আমলাদিগের সঙ্গে আমোদ আপ্যায়িত করিতাম ও সকলে সমবেত ভাবে আমন্ত্রিত হইয়া জমিদার বাড়ীতে সেরপুরের প্রসিদ্ধ ছানা গোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্নের সদ্ব্যবহার করিতাম। নয় আনীর বাড়ী সে কয়দিন নানা বেশ ভুষায় সজ্জিত হইয়াছিল। Liveried ser-

vants সকল মখমলের পোষাক পরিয়া রঙ্গিন উষ্ণীষ মাথায় বাঁধিয়া স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া সুন্দর দৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছিল। কমিসনার সাহেব সকলের সহিত মিষ্টালাপ ও সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন।

৷৷/০ আনীর জমিদার বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় যখন ৵০ তিন আনীর অন্যতর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বনওয়ারীলাল চৌধুরী (Dr. B. L. Chowdhury) মহাশয়ের সহিত তাঁহার কন্যা বাসন্তী দেবীর বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন সেই বিবাহ উপলক্ষে যে কবিতা উপহার দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে এই শীতল বাগানের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—

এখনও বসন্ত আছে যায়নিকো চলিয়া।
এখনও কোকিল ডাকে তরুডালে বসিয়া॥
পাপিয়ার পিউ রব ভ্রমর ঝঙ্কার।
জুঁই বেলী চামেলীর সৌরভ সঞ্চার॥
বসন্ত-সমীর-ধৌত শীতল বাগান।
বাসন্তী-জনক-সৃষ্ট মনোজ্ঞ উদ্যান॥
তুলিতে বাসন্তী ফুল সে প্রমোদ বনে।
চলিলেন বনওয়ারী আনন্দিত মনে॥
আকাশে থাকিয়া আজ দেব দেবীগণ।
করিবেন আশীর্ব্বাদ পুষ্প বরিষণ॥
সরল হৃদয়ে আজ ভক্তি যুক্ত মনে।
এই তো প্রার্থনা করি ঈশ্বর চরণে॥
ধনে জনে সুস্থ মনে নবীন দম্পতি।
প্রেমের আদর্শ হয়ে করুন বসতি॥

সেরপুরের জমিদার মহাশয়েরা, ভদ্রতা, মিষ্টালাপ, নিরহঙ্কার ও বিনয়নম্র ব্যবহারের জন্য সকলেই প্রসিদ্ধ। রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ

চৌধুরী মহাশয় তখন পূরাদমে সাহেব। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদে কাজে কর্ম্মে চাল চলনে সাহেবী ধরণ ও discipline পূর্ণ মাত্রায়ই ছিল কিন্তু তাহাতে স্বাভাবিক ভদ্রতা প্রভৃতি গুণাবলীর কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। পরবর্ত্তী কালে আবার reaction পূরাদমে উপস্থিত হইয়া আমাদের সেই গৌরাঙ্গ সাহেবটিকে একেবারে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের আদত শিষ্য করিয়া ফেলিয়াছে। সাহেবী হ্যাট কোট ও নেকটাই সমুদয় নবদ্বীপে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিয়া তুলশীর প্রকাণ্ড মালা ও মাখনমাটীর ফোঁটা তিলক অঙ্গের ভূষণ হইয়াছে। যদি সাহেবী আমলে আহারে নিদ্রায় কোনরূপ ব্যভিচার হইয়া থাকে এখন অনাহারে অনিদ্রায় তপ জপ ও নিদিধ্যাসনে দিবা রাত্রি অতিবাহিত করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্টই হইয়াছে। রায় বাহাদুরের উভয় অবস্থাতেই তাঁহার কাছে যাতায়াত করিয়া দেখিয়াছি যে-কোন সৎলোক প্রীতি ও শ্রদ্ধা লইয়া তাঁহার কাছে গমন করে তাহাকেই তিনি বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

হরচন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় যাইয়া কোন দিন দেখিতাম তিনি স্কুলের কোন কোন শিক্ষককে লইয়া একত্রে বসিয়া সাহিত্যের আলোচনা করিতেছেন, কোন দিন কোন কাবুলীর সহিত কাবুলী ভাষায় আলাপ করিতেছেন, আবার কোন দিন দেখিতাম শিবেন্দ্র বাবু সেতার বাজাইতেছেন—সকলে তাহাই শুনিতেছেন। শেষ কালে তিনি কাজের বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র রায় বাহাদুর চারু বাবু ও হেমাঙ্গ বাবু যথা সময়ে ষ্টেটের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া প্রতিপত্তির সহিত তাহা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ীও এই সেরপুরেই বটে কিন্তু জমিদারপাড়া ও পুলিশ ষ্টেসন হইতে কিছু দূরে।

তর্কালঙ্কার মহাশয় যখন কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিতেন তখন তাঁহার কাছে যাইতাম এবং তাঁহার সাদরসম্ভাষণ ও মধুর আলাপে মুগ্ধ হইতাম। সেরপুরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারা তাঁহারা কেহই নিঃস্ব নহেন, সকলেরই ভূমি সম্পত্তি যথেষ্ট রহিয়াছে। তর্কালঙ্কার মহাশয়েরও ছিল কিন্তু তাঁহার সাংসারিক সচ্ছলতার সার্থকতা তাঁহার পুত্রদের মধ্যে কেহ কিছু করিয়া থাকিলেও তাঁহার নিজের জাঁক জমক মোটেই ছিল না! তিনি ঘরের মেজেতে মাদুর পাতিয়া বসিতেন ছাত্রগণকেও মাদুরে বসাইয়া পড়াইতেন, আমরা যাইয়া তাঁহাদের পার্শ্বে মাদুরাসনে উপবেশন করিতাম ও সেই শোভন দৃশ্য দেখিয়া আহ্লাদিত হইতাম। এবং তাঁহার সুমধুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতাম।

পুলিসে কায করার বিপদ ও অসুবিধা কত! নাম শুনিলেই লোকে মনে করে কি এক ভয়ানক জন্তু! কোন ভদ্র লোক সহজে কাছে আসিতে চায় না, তাহার নিকটে গেলেও সহসা ভিঁড়িতে দেয় না, সরিয়া পড়িতে চেষ্টা করে।

সেরপুর টাউনের পশ্চিম প্রান্তে এক নদী ও তাহার পাড়ে এক পল্লীগ্রাম—সেই নদী ও পল্লী উভয়েরই নাম সেরী—একবার কার্য্যোপলক্ষে সেই স্থানে গিয়াছিলাম। দেখিলাম সে গ্রামে হরসুন্দর তর্করত্ন ও দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস। বাড়ী বাড়ী টোল এবং তাহাতে নানা স্থান হইতে আসিয়া ছাত্রগণ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেছে। অধ্যাপক ও ছাত্র সকলে মিলিয়া শাস্ত্রালোচনা করে এবং আনন্দ কোলাহলে তাহাদের সময় অতিবাহিত হয়। এই দৃশ্য দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম, আমার মনের সেই আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য এবং তাহাদের সহিত আলাপ করিবার জন্য অধ্যাপক সমন্বিত ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলাম, দেখিয়া সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া

দাঁড়াইল ; কেহ মনে করিল বুঝিবা তাহাদের থানা তালাশী করিতে গিয়াছি, কেহ ভাবিল তাহাদের জবানবন্দী করিতে গিয়াছি ; আমি ঈষৎ হাস্য করিয়া যখন তাঁহাদিগকে বুঝিতে দিলাম যে আমিও একটা মানুষ ও ভদ্রলোক, তেমন ভয়ানক কোন জন্তুবিশেষ নহি এবং তাঁহারা কি আলোচনা করিতেছেন তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, তখন সকলে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন এবং যে বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল তাহা আমাকে জানাইলেন। সে সময়ে তথাকার একটী ছাত্র কাশীধাম থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছিল, কোন স্থানের একটা তাম্রলিপি মধ্যে যে সংস্কৃত শ্লোক লিখা ছিল কাশীর পণ্ডিতেরা তাহার নানারূপ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সেই ছাত্র ঐ শ্লোকটি এখানে পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং এখানকার জনৈক খ্যাতনামা পণ্ডিত (কৃত্তিরত্ন) তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া কাশীধামে উক্ত ছাত্রের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, সে তাহা সেখানকার পণ্ডিত ও ছাত্রমণ্ডলীমধ্যে উপস্থিত করিলে ব্যাখ্যা দেখিয়া সকলে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন এবং এই ব্যাখ্যা অতি সুন্দর হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কাশী হইতে এই সংবাদ সম্বলিত যে পত্র আসিয়াছে তাহাই সেদিনকার আলোচনার বিষয় ছিল, তাহা লইয়াই সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন। আমি সেই শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা শুনিলাম এবং তাঁহাদের আনন্দে যোগ দিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া গেলাম। তার পর হইতে টোলের ছাত্রগণ আমার থানা পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে লাগিল। কৃত্তিরত্ন মহাশয়ের পুত্র শশিভূষণ তখন বালক ছিলেন ও অধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন ; সেই প্রিয়দর্শন বালককে আমি বলিয়াছিলাম "কাব্যতীর্থ হইতে হইবে" ; তিনি হয়তো এখন যৌবন সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন—ভরসা করি আমার আশাবাক্য সফল হইয়াছে।

সেরপুর সহরে সপ্তাহের প্রত্যেক দিনেই একটা না একটা হাট বসিয়া থাকে। কোন্ দিনে কোন্ হাট জমে তাহা স্মরণ রাখার জন্য স্থানীয় একটি গাথা প্রাচীন কাল হইতে জনসাধারণের মুখে মুখে কথিত হইয়া আসিতেছে।

সোম, শুক্কুর, রঘুনাথ,
শনি, মঙ্গল, তেড়া।
রবি, গুরু, নয় আনী,
বুধ তিন আনীর ধারা॥

অর্থাৎ সোমবার ও শুক্রবারে রঘুনাথ বাজারে হাট মিলে। রঘুনাথ-জিউ নামে এক বিগ্রহ প্রাচীনকাল হইতে স্থাপিত আছেন। তাঁহার প্রকাণ্ড মন্দির ও প্রাঙ্গণযুক্ত বাড়ী ও তাহার সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এক বাজার রহিয়াছে, তাহাকেই রঘুনাথ বাজার বলে। রঘুনাথ জিউর সেবার জন্য পৃথক সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার আয়ও নিতান্ত সামান্য নহে, এই বাজারও সেই সম্পত্তিরই অন্তর্গত। রঘুনাথ জিউর বাড়ীতে "বেগার" না দিলে তাঁহার ভোগরাগের প্রসাদের তাৎপর্য্য সম্যক বুঝা যায় না। ভোগের মধ্যে পুরী পায়স প্রভৃতি নানা উৎকৃষ্ট দ্রব্যই থাকে কিন্তু তন্মধ্যে অড়হর ডালের খিচুড়ী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই দেবালয়ে যাইয়া প্রসাদ খাওয়াকে বলে "বেগার দেওয়া"; পূজারী ঠাকুর নিমন্ত্রণ করিতে যাইয়া বলেন, "আগামী কল্য রঘুনাথ জিউর বাড়ীতে যাইয়া বেগার দিবেন"।

আড়াই আনীর জমিদার বাড়ীর একটা বাজার আছে তাহাকে বলে "তেড়া বাজার"; সপ্তাহের মধ্যে শনিবার ও মঙ্গলবারে এই স্থানে হাট বসিয়া থাকে।

নয়আনীর বাড়ীর সম্মুখে প্রকাণ্ড এক বাজার—তাহাতে বড় বড় দোকান পাট অনেক আছে ; প্রত্যেক রবিবার ও বৃহস্পতিবারে এখানে সমস্ত দিন ব্যাপী হাট জমিয়া থাকে। নালিতাবাড়ী প্রভৃতি পাহাড় অঞ্চলের গারো হাজং জাতীয় বহু লোক এই হাটে যাইয়া ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। ৵১৫ আনীর জমিদার বাবু কিশোরীমোহন চৌধুরী মহাশয় একবার এই হাটের এক প্রতিযোগী হাট তাঁহার আপন বাড়ীর সম্মুখে বসাইয়া এই হাট ভাঙ্গিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে কতক দিন খুব ধর পাকড় হৈ চৈ ও মামলা মোকদ্দমা চলিয়াছিল। হাটরিয়া লোকদিগকে আকৃষ্ট করার কারণ—উভয় হাটে গান বাদ্য তামাসা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করা হইত। কিন্তু পরিশেষে পৌনে তিন আনীর নূতন হাট টিকিল না। নয় আনীর হাট অক্ষুন্নই রহিয়া গেল।

উল্লিখিত কিশোরী বাবু একজন সুশিক্ষিত উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন ; সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, সাহিত্যের চর্চ্চায় অনেক সময় কাটাইতে ভালবাসিতেন। সুখের বিষয় তাঁহার পুত্রগণ বিশ্ব বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া কৃতিত্বের সহিত উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

সেরপুরের অন্যতম জমিদার সন্তান বাবু মদনমোহন চৌধুরীর নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সেরপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সে সময়ে সেরপুর টাউনে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন, আমাদের মদনমোহন সেখান হইতেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বীজ হৃদয়ে লইয়া আসিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ নগরে আসিলে পর সে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। বাবু যাদবচন্দ্র গোস্বামী বি, এ, একজন পরীক্ষোত্তীর্ণ ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন তিনি তরুণ বয়স্ক, কলেজের শিক্ষা দীক্ষার প্রভাব তখন তাঁহাতে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। আপিসের

কার্য্য করিয়া অনেক সময়েই তিনি স্কুলের ছেলেদিগকে পড়াইতে ও তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইতেন। ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর নেতা বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের সহিত যাদব বাবুর বন্ধুতা ছিল, সেই সূত্রে তিনিও ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন। একদিন শাখাসমাজের এক উৎসব উপলক্ষে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ জন্য উক্ত যাদব বাবুর বাসায় ব্রাহ্মদিগের এক সভা হইয়াছিল। তাহাতে মদনমোহন যেরূপ উৎসাহ ও সৎসাহস দেখাইয়াছিলেন তাহাতে ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যগণ বুঝিয়াছিলেন যে ছাত্রদিগের মধ্যেও মানুষ আছে। পরদিন সহরে উল্লিখিত উৎসব উপলক্ষে নগর কীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল, তাহাতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট যাদব বাবু তসরের ধুতি পরিয়া গরদের চাদর গায় দিয়া নগ্নপদে হাঁটিয়া হাঁটিয়া কীর্ত্তন গাইয়াছিলেন। আমাদের মদনমোহন সেই কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন এবং অনেক ছাত্রকে টানিয়া সঙ্গে নিয়াছিলেন।

বাবু মধুসূদন সেন গোপী বাবুর বাসায় থাকিতেন, তাঁহাকে আমোদচ্ছলে একদিন বলা হইল "মশায়, আপনি আমাদের একদিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান না কেন?" তিনি তখন হিন্দু সমাজভীত ছাত্র-দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে "গোপী বাবুর বাসায় নিমন্ত্রণ করিলে তোমরা সেখানে যাইয়া খাইবে তো?" যাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাঁহারা সম্মত হইলেন এবং তদনুসারে নিমন্ত্রণও হইল কিন্তু অনেকেই হিসাব কিতাবে পড়িয়া গেলেন। পরে মদন বাবুর সাহসে ভর করিয়াই আমরা সকলে যাইয়া নিমন্ত্রণে যোগ দিয়াছিলাম। তখনকার দিনে বিশেষতঃ ব্রাহ্মের বাসায় ব্রাহ্ম-ভোজনে আয়োজন উদ্যোগ বিশেষ কিছুই ছিল না কিন্তু তথাপি সেই প্রীতিভোজন বড়ই তৃপ্তিজনক হইয়াছিল। বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের এক খুড়ী মা ছিলেন, তিনি আহ্লাদের

সহিত পাক ও পরিবেশন করিয়া আমাদিগকে খাওয়াইয়াছিলেন। সে দিনের আলুর দম ও আচারের সুস্বাদ আজও মনে রহিয়াছে।

স্কুলে ব্যায়াম শিক্ষা আমাদের সময়ে প্রচলিত ছিল না। তাহা ইদানিং প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বাবু মদনমোহন চৌধুরী আপন বাড়ীতে বরকন্দাজ ও দারওয়ান প্রভৃতি পশ্চিম দেশীয় পালওয়ানদের কাছে কুস্তি করিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর বেশ বলিষ্ঠ ও কষ্ট সহিষ্ণু ছিল। তিনি শারীরিক ও মানসিক বীর্য্য দেখিতে ও দেখাইতে সর্ব্বদাই বড় ভাল-বাসিতেন। সহরে দেশওয়ালীগণ যখন আখড়া করিয়া নানারূপ কছরত ও কুস্তী করিত এবং আমরা তাহা দেখিতে যাইতাম তখন মদন বাবু সে সকল দেখিতে দেখিতে এক একবার এমনই উত্তেজিত হইয়া পড়িতেন যে তাঁহাকে থামাইয়া রাখা আমাদের কষ্টকর হইত। "স্কুলে কেন ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয় না? ব্যায়ামের কেন পুরস্কার নাই?" বলিয়া মদন বাবু কত আক্ষেপ করিতেন! হায়! পরবর্ত্তী কালে যখন দেখিলাম স্কুল কলেজে ব্যায়াম শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইল এবং সে জন্য নানাবিধ পুরস্কারের ব্যবস্থা হইল, তখন সেই প্রিয় বন্ধুর কথা স্মরণ করিয়া কতই আক্ষেপ করিয়াছি!

সে কালে ময়মনসিংহ হইতে সেরপুর যাইতে ভদ্রলোকেরা নৌকা-যোগেই যাইতেন, তাহাতে ২।৩ দিন লাগিত কিন্তু অপর সাধারণ লোক হাঁটিয়া একদিনেই চলিয়া যাইত। মদন বাবু জমিদার, তাঁহাকে বাড়ী নেওয়ার জন্য তাঁহার পিতা বাড়ী হইতে নৌকা পাঠাইয়া দিতেন, কিন্তু মদন নৌকায় ২।৩ দিন শুইয়া বসিয়া চলা পছন্দ করিতেন না। তিনি নসিরাবাদ হইতে রওনা হইয়া বরাবর হাঁটিয়া চলিয়া যাইতেন, সঙ্গীয় বামন খানসামা ও বেগড়ীগণ পিছনে পড়িয়া থাকিত। সেরপুরের নিকটে যাইয়া তিনি অপেক্ষা করিতেন এবং রাত্রি হইলে পর সহরে ও

বাড়ীতে প্রবেশ করিতেন। দিনমানে জমিদার সন্তানকে হাঁটিয়া যাইতে দেখিলে লোকে নিন্দা বা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবে, আপন বাড়ীর লোকেরাও লজ্জিত ও অসন্তুষ্ট হইবে। অনেক উচ্চ আশা হৃদয়ে লইয়া মদনমোহন এই সংসারে আসিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে অনেক উৎকৃষ্ট কার্য্য সংসাধিত হইবে বলিয়া আমরাও আশা করিয়াছিলাম কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। ছাত্র জীবন শেষ না হইতেই মদন বাবু আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নেত্রকোণা।

১৮৮২ সালে নেত্রকোণায় নূতন সব্‌ডিভিসন্ খোলা হয়। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাবু মৈত্রগোপাল রায় সব্‌ডিভিসন্যাল অফিসার হইয়া সেখানে গমন করেন। তথাকার কোর্ট সব্ ইন্স্‌পেক্টরের কাজ করার জন্য আমাকে জামালপুর হইতে সেখানে বদ্‌লী করা হয়। আমার সেই বদ্‌লী রহিত করিবার জন্য সেরপুর ও জামালপুর হইতে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেবসমীপে দরখাস্ত পড়িয়াছিল কিন্তু সাহেব লিখিয়া পাঠাইলেন "নেত্রকোণার নূতন মহকুমা খোলা হইয়াছে, সেখানে কাজ খুব বেশী, তাহা সুচারুরূপে চলিতেছে না, জামালপুর কোর্টের work light, আমাকে আর সেখানে রাখা হইবে না।" আমি অকুণ্ঠিতচিত্তে ও উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে নেত্রকোণা চলিয়া গেলাম।

সেখানে যাইয়া দেখি সব বিষয়ে সে এক নূতন স্থানই বটে। শিক্ষা সভ্যতা আইন কানুন রাস্তা ঘাট সকলই নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে, সেখানে কিছুই নাই। উকীল বাবুদের বাসায় যাইয়া দেখি এক একখানা বাসা যেন এক একটি গৃহস্থের বাড়ী, সারা বছরের জ্বালানীকাঠ একত্রে কিনিয়া রাখা হইয়াছে, বাসায় বাসায় তরি তরকারী লাগান হয়। সে দেশে দধি দুগ্ধ বিক্রী করার প্রথা নাই সুতরাং কিনিতে পাওয়া যায় না। এক সপ্তাহের আন্দাজ মরীচ মশলা নুন তেল তামাক আগাও কিনিয়া রাখিতে হয় কারণ দৈনিক বাজার নাই। মফঃস্বলে মুসলমানের দৌরাত্ম্য অত্যধিক, তাহারা আইনানুযায়ী বিচার ও শাস্তি ইত্যাদিতে অভ্যস্থ নয়। সেই দেশটা সমস্ত গৌরীপুর ও রামগোপালপুরের জমিদারের এলাকাধীন কিন্তু প্রজা সকল নিতান্ত অশাসিত। তাহারা

জমিদারী কাছারীর নায়েবকে মান্যকরা দূরে থাকুক, নায়েবের নায়েবতী থাকে না যদি সে প্রজাদের মন যোগাইয়া না চলে। এসম্বন্ধে আমরা নেত্রকোণা যাইয়া কত আশ্চর্য্য ও আমোদজনক গল্পই শুনিলাম। যথা, ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিষ্যালয়ে চলিয়াছেন কিম্বা তর্কালঙ্কার মহাশয় কোন নিমন্ত্রণে চলিয়াছেন, সঙ্গে তল্পীসহ ভৃত্য যাইতেছে, পথ চলিবার কোন সড়ক নাই, ক্ষেতের আইল দিয়াই হাঁটিতে হয়, চাষা মুসলমানেরা ক্ষেত নিরাইতেছে, ঠাকুরকে দেখিয়া বলিল "কোথা যাও ঠাকুর? বৈস, কিছুকাল ঘাস বাছিয়া দিয়া যাও!" ঠাকুরের আর দ্বিরুক্তি করিবার যো নাই, আপত্তি করিলে জাত কুল আর থাকে না, কাযে কাযেই ২।১ ঘণ্টা কাল ভৃত্যসহ ঠাকুর সেই চাষার ক্ষেত নিরাইয়া দিয়া গেলেন।

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট R. H. Pawsey সাহেব নসিরাবাদ হইতে নেত্রকোণা যাইবেন, তাঁহার ঘোড়ার ডাক বসিয়াছে, সহিস ঘোড়া লইয়া গাছ তলায় বসিয়া আছে, দুইজন চাষা মুসলমান যাইয়া সহিসের হাত হইতে ঘোড়া কাড়িয়া নিয়া কতক্ষণ 'লাম্বী' দৌড়াইয়া আনিয়া সহিসের কাছে ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। সাহেব অন্য ঘোড়ায় সহর হইতে যাইয়া দেখেন ডাকের ঘোড়া শ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সহিস দেখাইয়া দিল, চাষা এই মাত্র ঘোড়া ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। সাহেব অমনি ঘোড়া চালাইয়া যাইয়া সেই চাষাকে খুব কতক ঘা চাবুক লাগাইয়া দিলেন।

ভদ্র বিশিষ্ট লোক উপযুক্ত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া হাতী চড়িয়া যাইতেছেন, চাষা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিবে, হাতী কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় যাইবে? কেহ ঘোড়া চড়িয়া যাইতে দেখিলে জিজ্ঞাসা করিবে, ঘোড়া কোথা হইতে আসিল ও কোথা যাইবে? তাহার

মূল্য কত এবং কদম আছে কি না এবং তাহার পরেই অর্ডার করিয়া ফেলিবে "একটু কদম চালাও দেখি!"

যে স্থানে নেত্রকোণা সবডিভিসনের হেড্‌কোয়ার্টার হইয়াছে সেই জায়গাটার নাম কালীগঞ্জ। সেখানে খুব বড় একটা হাট আছে, সপ্তাহে একদিন হাট মিলে এবং নানাবিধ প্রয়োজনীয় জিনিষ প্রচুর পরিমানে আমদানী ও বিক্রয় হইয়া থাকে। তা ছাড়া কালীগঞ্জের হাটে ধনী মহাজনের কাপড় ইত্যাদির বড় বড় দোকান সকল রহিয়াছে। সেই বাজারটা গৌরীপুর জমিদারের একচেটিয়া মহাল, বাজারের মাতব্বর সাহা মহাজন সকলই সেই সরকারের প্রজা। প্রজা বটে, কিন্তু বাজারের উপরেই যে জমিদারের কাছারী আছে তাহার আমলাদিগকে উহারা গ্রাহ্যই করে না। একবার এক নায়েব কাছারিতে একটা ফরাশের বিছানা করিয়া তাহাতে এক তাকিয়া ও একটা ফরশী হুঁকা রাখিয়াছিলেন, বাজারের প্রজারা বলিয়া বসিল, "কিরে? নায়েব নাকি তাকিয়া ও ফর্শীহুঁকা করিয়াছে? আমাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই এত জাঁক? আমরা তো এই কাছারিতে আর যাইব না।"

থানার এক কনেষ্টবলের সঙ্গে বচসা হওয়াতে তাহাকে ধরিয়া এক দোকানে নিয়া দোকান ঘরের মধ্যে যে কাপড় রাখার মাটির কোঠা থাকে সেই কোঠার ভিতরে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল, পরে সব ইন্সপেক্টর গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সেই সংবাদ পাইয়া বন্দুক লইয়া দলে বলে যাইয়া কয়েদী খালাস করিয়া আনেন। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত গ্রেট সাহেব নেত্রকোণার থানায় যাইয়া সেই মোকদ্দমার বিচার করেন। তখন গিরিশ বাবুর হাতে সাহা মহাজনেরা অনেকেই খুব লাঞ্ছিত হইয়াছিল।

দেশের ও স্থানের যখন এইরূপ অবস্থা আমরা সেই সময়ে যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলাম। বাবু ক্ষেত্রগোপাল রায় vigorous ad-

ministration আরম্ভ করিলেন, আমি যথাসাধ্য তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলাম।

নেত্রকোণা সবডিভিসনে নসিরুজিয়াল পরগণার মধ্যে লূনেশ্বর একটা গণ্ডগ্রাম, সেটা কেবলই দস্যু তস্করের বাসস্থান বলিয়া দেশে বিদেশে চিরকাল খ্যাত। ময়মনসিংহ জেলার বারহাট্টা আউট পোষ্টের এলাকা ও শ্রীহট্ট জেলার ধরমপাশা আউট পোষ্টের এলাকা পরস্পর সংলগ্ন, উভয় এলাকাই চোর বদমায়েসে পরিপূর্ণ। সেই এলাকার চোর এই এলাকায় আসিয়া চুরি করিয়া চলিয়া যায়, আবার এই জেলার লোক সেই জেলায় যাইয়া চুরি করিয়া চলিয়া আসে, কোথাও কেহ ধরা পড়ে না।

এই সকল চোর বদমায়েসের দৌরাত্ম্যে সবডিভিসনের সকল লোক ব্যতিব্যস্ত কিন্তু তাহার প্রাতকারের কোন চেষ্টা কেহ করে না কারণ করিবার সুযোগ ও সুবিধা পায় না। ৩।৪ দিনের পথ হাঁটিয়া ময়মনসিংহ যাইয়া খরচ পত্র করিয়া কে মোকদ্দমা করিতে যাইবে ?

তদন্তে প্রকাশ পাইল লূনেশ্বরের চোরদিগের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা করার একটা প্রথা নাই, কারণ তাহা করিয়া কেহ কোন দিন কৃতকার্য্য হইতে পারে না। কিন্তু তাহাদের সহিত আপোষ বন্দোবস্ত করার এক সুন্দর প্রণালী প্রচলিত আছে। সিঁদচুরি অপেক্ষা গরু-চুরি ও নৌকা চুরি এবং জলপথে নৌকা হইতে লোকের জিনিষ পত্র লুটিয়া নেওয়ার কার্য্যেই এই সকল লোক অধিক অভ্যস্থ। 'গনেশের হাওর', 'তলার হাওর' প্রভৃতি ঝিল সংযুক্ত এক এক মাঠ এমনি প্রকাণ্ড যে তাহার মধ্য স্থান হইতে বন্দুক ছুড়িলে কিম্বা ডঙ্কা পিটিলে সেই শব্দ যাইয়া পঁহুছিতে পারে এত দূরেও,কোন লোকালয় নাই, একদিক হইতে অন্যদিকের কূল কিনারা কিছু দেখা যায় না। এরূপ স্থলে দস্যুগণ যে দিনমানে ডাকাইতি করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? লুনেশ্বরের আশে পাশে এমন সকল বিল ঝিল

রহিয়াছে যাহাতে চোরেরা চুরির নৌকা সকল নিয়া অনায়াসে ডুবাইয়া রাখিতে পারে। এমন সকল মাঠ আছে যাহাতে চুরি করা গরু চরাই করিয়া রক্ষা করিতে পারে তাহাতে কোন অসুবিধা নাই।

তস্করদের মধ্যেও নেতা এবং পরিচালক আছে, নিয়ম প্রণালী (discipline) ঠিক আছে। সকলে সকল চুরিতে যায়না অথচ অনেকে ঘরে বসিয়াও ভাগ পায়, আবার সর্দ্দার চোর যে হুকুম করিবে তাহা অপর সকলেই মানিয়া চলিবে।

তোমার দুইটী বলদ গরু চুরি গিয়াছে? থানায় নালিশ করিয়া কি হইবে? তুমি লূনেশ্বর যাও, সেখানে চোরের সরদার বদল মণ্ডলের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির কর, তাহার সহিত দেখা কর, আলাপ কর, তবেই তোমার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে। দেখা করিলে বদল জিজ্ঞাসা করিবে "তোমার বলদ কোথায় গিয়াছে? আমাকে বল দেখি তাহার মূল্য কত হইবে?" তুমি উত্তর করিলে "মণ্ডল আমার একটা বলদ লাল ও একটা কালো রঙ্গের, দুটাই খুব মোটা মোটা ও বলবান; মূল্য এক একটার ৪০৲ টাকার কম হইবে না।" তখন মণ্ডল উত্তর করিবে "আচ্ছা, মূল্যের অর্দ্ধেক টাকা লইয়া আসিও, আমি দেখি তোমার গরু পাওয়া যায় কি না।" তারপর বদল মণ্ডল চোর পাড়ার সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে এই কার্য্যটা কে কে করিয়াছে এবং যাহারা চুরি করিয়াছে তাহারা আসিয়া স্বীকার করিলে পরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সেই বলদ রাখিয়া যখন মালিক আসিবে তখন তাহার নিকট হইতে ৪০৲ টাকা লইয়া বলিবে "দেখ যাইয়া তোমার বলদ দুইটি ঐ মাঠের মাঝে কদম গাছের তলায় ঘাস খাইতেছে, সেখান হইতে লইয়া যাও।" অতঃপর সে স্থান হইতে গরু লইয়া যাইতে আর কোন দোষ নাই। নৌকা চুরি সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ ছিল।

তদন্তে ইহাও প্রকাশ হইয়া পড়িল যে কোন চুরি মোকদ্দমার এজাহার

হইলে পর বারহাট্টা আউট পোষ্টের পুলিস কার্য্যকারক তাহার তদন্ত করিতে যাইবেন বলিয়া আগেই বদল মণ্ডলের নিকট সংবাদ পাঠাইতেন, সেও তাঁহার তদন্তের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিত। কখনও বা খানা তালাশী কখনও বা জিজ্ঞাসা বাদ করিয়া পুলিস-তদন্ত হইয়া যাইত, তারপর তাঁহাদের মধ্যে যাহা হইত তাহা কি প্রত্যেক মোকদ্দমাতেই হইত না, সে সম্বন্ধে বার্ষিক কি মাসিক কোন বন্দোবস্ত ছিল, তাহা কেহ বলিতে পারিত না। তবে বারহাট্টার তদানিন্তন পুলিস কার্য্যকারক সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে পরবর্ত্তী কালে জানা গিয়াছে ঐরূপ কার্য্য শুধু বারহাট্টা ও কালিহাতী থানায়ই চলিতেছিল এরূপ নহে, অন্যান্য কোন কোন স্থান হইতেও তদ্রূপ দুর্ণাম শুনা গিয়াছে, কারণ এ রোগটা স্থানগত নহে, ব্যক্তিগত বটে।

নেত্রকোণায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রভাব কোথায় বা অনুভব করিব কাহাকেই বা অনুভব করাইব? সমাজ তখনও প্রায় আদিম অবস্থাতেই রহিয়াছে, মাঝে মাঝে মুন্‌সেফ বেশে ২।১টি শিক্ষিত যুবক তথায় যান বটে কিন্তু কুসংসর্গে পড়িয়া নীতিবিহীন হইয়া পড়েন। তবে আমি ইহাতেই শ্লাঘা ও সৌভাগ্য বোধ করিয়াছি যে যাহারা পূর্ব্বে সুরাপান ও অন্যবিধ কুৎসিৎ আমোদে সর্ব্বদাই লিপ্ত থাকিত, আমি তাহাদিগকে যথেষ্ট সংযত করিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। যে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বে কেবল আমোদ প্রমোদ করিয়াই মফঃস্বল পর্য্যটনের কায শেষ করিয়া আসিতেন আমি তাঁহার দ্বারা গ্রামে গ্রামে স্কুল পরিদর্শন ও পাঠশালা স্থাপনের চেষ্টা করাইয়াছি, তিনিই দুষ্টের শাসন ও ভদ্রের সম্মান রক্ষা করিয়া প্রজা ভূম্যধিকারীর বিবাদ মিটাইয়া এবং পরস্পর বিরোধী ও বিবাদপ্রিয় ভদ্রলোকদের মধ্যে আপোষ মীমাংসার যথা সম্ভব চেষ্টা করিয়া স্থানীয় উন্নতি ও মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন।

সবডিভিসনাল আফিসারকে লইয়া এলাকা মধ্যে পূর্ব্বধলার রাজাদিগের বাড়ীতে, শঙ্করপুরস্থ লাহিড়ী জমিদার ও নারণডহরের চক্রবর্ত্তী জমিদার এবং সুসঙ্গাধিপতি মহারাজার দুর্গাপুরস্থ বাড়ীতে তিনি সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সকলের অবস্থা অবগত হইয়াছেন। সমাজ, বাড়রী, রায়পুর, ও নওপাড়া প্রভৃতি ভদ্রলোকেদের গ্রামে গ্রামে আমরা যাইয়া কাছারী করিয়াছি। সকলে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া আপন আপন অভাব অভিযোগের কথা জানাইয়াছে, আমরা যতদূর সম্ভব সে সকল অভাব পূরণ করিতে ও অভিযোগের সুবিচার করিতে চেষ্টা করিয়াছি, অধিকাংশ লোক তাহাতে আপ্যায়িত হইয়া গিয়াছে।

সুসঙ্গাধিপতির রাজধানী এবং পাহাড় পরিদর্শন বিশেষ স্মরণীয় বিষয় বটে। মহারাজের সুশিক্ষিত শিকারী হাতী অনেক গুলি ছিল, তাহাতে চড়িয়া পাহাড়ে উঠা বড়ই আমোদ জনক। আমি যে হাতীতে চড়িয়া ছিলাম তাহার নাম ছিল গোলবাহার, এবং আনওয়ারকলীতে উঠিয়া ছিলেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ক্ষেত্রগোপাল রায়। আমাদের সঙ্গে আরো কয়েকটা হাতী ছিল এবং তাহার একটাতে ছিলেন বাবু দুর্গাপ্রসাদ সরকার পেস্কার। ঐ সকল হাতী পাহাড়ের গায় আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া লতাটা, গাছটা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতে খাইতে যখন উপরে উঠে, বিশেষত পেছনের দুই পা ভাঙ্গিয়া দিয়া সম্মুখের দুই পা সোজা খাড়া করিয়া যখন পাহাড়ের উপর হইতে নীচে নামিয়া আইসে তখন যে কেমন সুন্দর দেখায় ও তাহাতে হাতীগুলির কেমন শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা না দেখিলে কেহ সম্যক বুঝিতে পারিবেন না। হাতিগুলি ঐরূপ ভাবে পীঠ সমান রাখিয়া না নামিলে তাহাতে মানুষ বসিয়া থাকা অসম্ভব হইত।

পাহাড়ের উপরে উঠিয়া যখন আমরা মহারাজের চা বাগান আর

দুসঙ্গের স্বর্গীয় মহারাজ রাজকৃষ্ণ সিংহ

কমলা নেবুর বাগান দেখিতেছিলাম তখন নীচে উপত্যকার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেখানে যে সকল হাতী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে সে সকলকে এত ছোট দেখায়, বোধ হয় যেন বড় বড় শূকরগুলি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, পার্শ্বে সোমেশ্বরী নদীর জলস্রোত একটি প্রশস্ত রজতরেখার ন্যায় বিবেচনা হয়। মহারাজার বাড়ীতে বৈঠক খানায় ও কাছারী বাড়ীতে যাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহা অদ্যাপি স্মরণ রহিয়াছে। সে কিন্তু ১৮৮৩ সনের কথা, তারপর ১৮৮৬ সালের প্রলয়কারী ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, সুতরাং রাজধানী ও রাজবাড়ীতে ইদানিং বহু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে, বিশেষতঃ পরবর্ত্তী মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিং বাহাদুরের সময়। স্বর্গীয় মহারাজ রাজকৃষ্ণ সিংহ তাঁহার পুত্রকে নানা বিষয়ে সুশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতানুমোদিত শিক্ষা লাভ না করিলে উন্নতি-শীল সময়ের সঙ্গে যোগ রাখিয়া চলা সুকঠিন হইবে এই বিবেচনায় ইঁহাকে সেই ভাবেই শিক্ষিত ও ইঁহার চরিত্র তেমনি ভাবেই সুগঠিত করিয়া গিয়াছেন। মহারাজ কুমুদচন্দ্র যেরূপ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিভা যেরূপ প্রখর ও রুচি যেরূপ মার্জ্জিত, হৃদয় যেরূপ উদার ও প্রশস্ত এবং পিতৃ গৌরব ও বংশ মর্য্যাদা রক্ষা কল্পে তাঁহার যেরূপ আগ্রহ তাহাতে অনুমান করি তিনি রাজপ্রাসাদের পুনর্গঠন কালে অবশ্যই সুরুচি সঙ্গত পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকিবেন।

রাজভ্রাতা জগৎকৃষ্ণ সিং সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, তিনি আসাম প্রদেশের পুরাতত্ব প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে সঙ্কলন করিয়া গারো হিল প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশের নানা তথ্য সংগ্রহ ও আলোচনা করিতেছেন তাহা আমাদিগকে দেখাইলেন। আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

সবডিভিসানল অফিসারের সঙ্গে তাঁহার ক্যাম্পে আমলা উকীল

মোক্তার প্রভৃতি যে সকল ভদ্র লোক ছিলেন রাজপ্রাসাদে সে সকলেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। আমরা ভোজনে বসিলে দেখিলাম মহারাজা স্বয়ং সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া পরিবেশন পর্য্যবেক্ষণ ও নানারূপে সৌজন্য প্রকাশ করিতেছেন, আমরা সলজ্জভাবে বলিলাম, অন্ততঃ একটা আসন আনাইয়া বসিলেই ভাল হয় নচেৎ আমরা বসিয়া ভোজন করিতেছি আর মহারাজ সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন সেটা কেমন দেখায়। তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, তাঁহার কোন ক্লেশ হইতেছেনা, এরূপ কাজে তাঁহারা অভ্যস্থ। আমরা কিন্তু দেখিয়াছি অনেক জমিদার বাড়ীতে এ সকল কাজ নায়েব গোমস্তার দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

আমি তখন দেখিয়া ছিলাম টেবিল চেয়ারের কোন বন্দোবস্ত ছিল না, মাটিতে তক্তপোষের উপর ফরাশ পাতিয়া তাহাতে গালিচা ও মসলন্দ ইত্যাদি দ্বারা পদমর্য্যাদা ও বংশ মর্য্যাদানুসারে বসিবার ও বসাইবার বন্দোবস্ত ছিল। দেয়ালে যে কয়খানা ছবি দেখিলাম তাহাতে মহারাজা সিন্ধিয়া, গোয়ালিয়ার ও রঞ্জিত সিং এবং তাদৃশ আরো ২।১ খানা ব্যতীত আধুনিক সভ্যতানুমোদিত কোন ছবি ছিল না। বারাণ্ডায় বউকথাকও পাখী, শ্যামা, দয়েল, হলদেপাখী ও বুল বুল আপন আপন খাঁচায় থাকিয়া যখন যাহার ইচ্ছা স্বরলহরী ছাড়িতে থাকে, বৈঠক খানায় বসিয়া মহারাজও তাঁহার সভাসদ সকলে তাহা সম্ভোগ করেন। আঙ্গিনায় ছোট ছোট হরিণ ও ময়ূর চরিয়া বেড়াইতেছে, দেখিতে কি সুন্দর! আবার মহারাজা রাজকৃষ্ণ সিং ও তাঁহার ভ্রাতাদিগের প্রকৃতি, চরিত্র ও বাক্যালাপ আরো অধিক সুন্দর ও সুমিষ্ট। কথা প্রসঙ্গে মহারাজ বলিলেন—"পালকী, সে তো জেনানার সোওয়ারী; লাফাইয়া চড়িব, লাফাইয়া পড়িব, পুরুষের ন্যায় হাতী দৌড়াইয়া যাইব—সেটাই তো আমরা ভালবাসি।" দেখিলাম সুসঙ্গে যাহা কিছু স্বভাব-সুন্দর তাহাই

একত্রে মিলিত হইয়া সুসঙ্গ নামের সার্থকতা সম্পন্ন করিয়াছে, সেখানে কৃত্রিমতার সমাদর নাই। কোন প্রয়োজনও নাই।

নেত্রকোণায় মহকুমা খোলা হইলে পর ডিষ্ট্রীক্ট রোডসেছ কমিটীতে সেই মহকুমার জন্য দুইজন মেম্বর নিযুক্ত হইল। তাহার একজন হইলেন সবডিভিসনেল অফিসার স্বয়ং, আর একজন হইলাম আমি। বর্ষাকালে কমিটীর এক মিটিং হইল; এই কালে নেত্রকোণা হইতে ময়মনসিংহ যাতায়াত বড় কষ্টকর। ডেপুটী বাবু সে মিটিঙ্গে না যাইয়া আমাকেই পাঠাইলেন। আমি সহরে যাইয়া দেখি কিশোরগঞ্জ হইতে সবডিভিসনেল অফিসার বাবু কাশীকিঙ্কর সেন, জামালপুর হইতে মেঃ নন্দকৃষ্ণ বসু, টাঙ্গাইল হইতে নন-অফিশিয়াল মেম্বর বাবু ঈশানচন্দ্র গুপ্ত এবং মুক্তাগাছার জমিদার মহাশয়দের মধ্যে কেহ কেহ মিটিং করিতে আসিয়াছেন। নবাগত ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. R. M. Waller কমিটীর প্রেসিডেন্ট, মিটিং হইবে তাঁহার কুটীতে আলেকজাণ্ডার কেস্‌লে।

কমিটীর কাজ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই আমি একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত সভাগণকে জানাইলাম যে Road Cess Act পাস হইয়া cess স্থাপন হওয়ার কাল হইতে এ পর্য্যন্ত নেত্রকোণা বাসী প্রজাগণ সেই cess দিয়া আসিতেছে কিন্তু তাহার ফল ও সুবিধা যাহা কিছু ভোগ করিতে হয় তাহা সকল সবডিভিসনই ন্যূনাধিকরূপে ভোগ করিতেছে,কেবল নেত্রকোণাবাসী প্রজাগণই তাহা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। সেই এলাকায় একটিও রোড নাই, রাস্তা নাই, লোক যাতায়াতের নিতান্ত অসুবিধা। অতএব টাকা বিভাগকালে নেত্রকোণার দাবি অগ্রগণ্য হয় এবং সকলে অনুগ্রহ করিয়া সেই ডিভিসনে কিছু জেয়াদা টাকা মঞ্জুর করেন এই আমার প্রার্থনা। সকলেই আমার কথা মনোযোগ দিয়া শুনিলেন, কেহই কোন আপত্তি করিলেন না; তখন চেয়ারম্যান

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মস্তক উত্তোলন না করিয়া সম্মুখস্থ টেবিলে দুই হাতে ভর দিয়া, কেবল মাত্র টেবিলের উপরই দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া গম্ভীর ভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, 'নেত্রকোণার মেম্বর যাহা বলিলেন তাহা শোনা গেল, যথাকালে তাহার বিবেচনা করা যাইবে।' টাকা বিলি হওয়ার সময় আবার দাঁড়াইলাম, নেত্রকোণার জন্য টাকা কিছু অধিকই মঞ্জুর হইল। মিটিং ভাঙ্গিয়া গেল, আমরা চলিয়া গেলাম। মিটিঙ্গের ফল দেখিয়া নেত্রকোণা বাসী ভদ্র লোকেরাও সন্তুষ্ট হইলেন, আমিও আত্মপ্রসাদ ভোগ করিলাম।

নেত্রকোণা থাকা কালে তথাকার স্কুলের পণ্ডিত বাবু চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়কে উপলক্ষ্য করিয়া সভা স্থাপন করা গিয়াছিল এবং তাহার নাম রাখা হইয়াছিল—নেত্রাকাণা এসোসিয়েসান। স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়া সেই সভায় অলোচনা করা হইত এবং সময় সময় তাহাতে জন সাধারণকে আহ্বান করা হইত। তখন পর্য্যন্ত সেখানে এণ্ট্রেন্স স্কুল স্থাপিত হয় নাই, মুনসেফ দুইজন ব্যতীত একটিও বি, এ, পাস্ করা লোক সে দেশে ছিল না, উকীলদিগের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নর্ম্ম্যাল স্কুলের ছাত্র।

এই সময়ে কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম জজ শ্রীযুক্ত নরিশ সাহেব কোন এক মোকদ্দমা উপলক্ষে হিন্দুদিগের একটি বিগ্রহ কোর্টে উপস্থিত করার আদেশ করিয়াছিলেন, বেঙ্গলী সংবাদ পত্রের সম্পাদক বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কাগজে সে সম্বন্ধে অতি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং তাহাতে contempt of court—আদালত অবজ্ঞা করা—হইয়াছে বলিয়া সুরেন্দ্র বাবুকে ফৌজদারীতে অভিযুক্ত করা হয় এবং দুই মাস সিভিল জেইলে কয়েদ থাকার আদেশ হয়। তখন দেশের সমুদয় যুবক এবং প্রাচীনদের মধ্যেও কতক কতক সুরেন্দ্র বাবুর

নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে, এই ঘটনাতে তাহারা সকলে বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। সে সময়ে Indian Mirror পত্রিকার খুব সম্মান ও পশার, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন তখন রায় বাহাদুর হন নাই। এই ঘটনা উপলক্ষে দিনের পর দিন তিনি যে সকল আর্টিকেল লিখিয়া মিরার পত্রিকায় বাহিব করিতেন তাহা পাঠ করিয়া সকল লোক সন্তুষ্ট হইত। সেরূপ তেজের লিখা ও সেরূপ জোরের লিখা আর্টিকেল পরবর্ত্তীকালে রায় বাহাদুরের কাগজে আর বড় দেখা যায় নাই। কিন্তু যে সকল সুযুক্তি দ্বারা ও যেরূপ সহৃদয়তার সহিত তিনি সুরেন্দ্র বাবুর পক্ষ সমর্থন করিয়ছিলেন তাহা নিতান্ত প্রশংসনীয় এবং সুরেন্দ্র বাবু কারাগারে থাকিয়াই তাঁহার বেঙ্গলী পত্রিকাতে তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

সংবাদ পত্রে যখন এই সংবাদ নেত্রকোণা যাইয়া পহুছিল তখন আমরা কোর্টে কাজ করিতেছিলাম। সংবাদে অনেকেই বিমর্ষ হইল। হাইকোর্টে সুবেন্দ্র বাবুব বিচাব কালে কিরূপ জনতা হইয়াছিল স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ কিরূপে উত্তেজিত হইয়া কোর্টেব জানালা প্রভৃতির সারশী পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল এই সকল বিবরণ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া কত লোক যাইয়া আমাদিগকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। তাহাবই মধ্যে একটি মোক্তার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবু ব্যাপারটা কি? আপনাদিগকে যে এত ব্যস্ত ও বিষণ্ণ দেখিতেছি; হয়েছে কি?" বিষয়টা সংক্ষেপে শুনাইয়া দিলে তিনি বলিলেন "কি, হাইকোর্টের জজের বিরুদ্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন? তাঁর কি বাঘের লেজ দিয়া কাণ চুলকাইতে সাধ হইয়াছিল? দেশ শুদ্ধ আর লোক পাইলেন না, লিখিয়া বসিলেন হাইকোর্টেব জজের বিরুদ্ধে। এখন! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।" সবডিভিসনেল অফিসার নিজেও তখন তাঁহার সংবাদ পত্র পড়িতেছিলেন। তিনি মোক্তারের ঐ উক্তি শুনিয়া ধমক দিয়া

বলিলেন "রে মূর্খ তুমি কি বলিতেছ? সুরেন্দ্র বাবু যে কি একটা লোক তা কি তুমি জান? না, বুঝিবার শক্তি রাখ?" মোক্তার অমি জোড় করে, "না ধর্ম্মাবতার, আজ্ঞা না—না ধর্ম্মাবতার! আপীল করিতে লিখিয়া পাঠান, এ হুকুম বহাল থাকিবে না," বলিল। কাছারীতে এক হাসির রোল উঠিল, মোক্তারকে নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। তখন আবার মৃদুস্বরে বলিলেন "বিনাশ্রমে ২ মাস—আপীল না করিলেই বা কি?"

কারাগারে সুরেন্দ্র বাবুর অবস্থা কিরূপ তাহা জানিবার জন্য দেশের বিশেষতঃ মফঃস্বলে দূর দেশের লোক বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে আমাদের অন্যতম সুহৃদ ময়মনসিংহের গৌরব রবি আনন্দমোহন বসু মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এখানে প্রকাশ করা গেল:

BAR LIBRARY
CALCUTTA
10th. July, 1883.

Dear Kalikrishna Babu,

I sit down only to express my regret to you at not having been able to answer your note received so very long ago. The information you wanted would now be of no interest, and yet I have no doubt you will be glad to learn that our friend Mr. Surendra Nath Banerjee has had no discomforts in the Jail and he comes back as hale and hearty as ever. We all trust that the agitation and excitement which the country has gone through will not have been in vain but that this will result in earnest and practical action and substantial good.

Hoping to be excused for my inability to write to you earlier and trusting this will find you all right,

I remain
Yours truly
(Sd.) A. M. Bose.

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৮৭২ সালে বাবু তারিণীপ্রসাদ রায় টাঙ্গাইলের Sub divisional officer ছিলেন। তখন গ্রেহাম সাহেব ছিলেন ময়মনসিংহের ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। তারিণীবাবু টাঙ্গাইলে একটি মাইনর স্কুল স্থাপন করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'গ্রেহাম স্কুল।' ১৮৭২ সনে তারিণীবাবুর স্থলে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মেঃ E. S. Andrew সাহেব টাঙ্গাইল যাইয়া দেখিলেন, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে গ্রেহাম স্কুল নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের নেতা বাবু গোপী-কৃষ্ণ সেন মহাশয়ের সহিত এ্যাণ্ড্রু সাহেবের বিশেষ পরিচয় ছিল, একজন ভাল হেডমাষ্টার দেওয়ার জন্য সাহেব গোপীবাবুকে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিলেন। গোপী বাবু সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে আমি একবৎসর কাল টাঙ্গাইলে গ্রেহাম স্কুলের হেড মাষ্টারী করিয়াছিলাম। সে সময়ে বাবু তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী সন্তোষ জাহ্নবী স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। তিনি একজন সুশিক্ষিত চরিত্রবান শিক্ষক ও অতি উদ্যমশীল ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি জাহ্নবীস্কুলে যাইয়া টাঙ্গাইল অঞ্চলে এক নবযুগের আবির্ভাব সমুপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি উৎসাহ উদ্যমশীল যুবকদিগকে তাঁহার সহযোগী শিক্ষকরূপে সন্তোষে আনিয়া জুটাইতেন। বাঘিল গ্রামবাসী বাবু কালীকুমার বসু একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম। তিনি কিছুকালের জন্য টাঙ্গাইল সবডিভিসনের সিরিস্তাদার হইয়া গেলেন। তাঁহার ভ্রাতা বাবু দুর্গাদাস বসু সেখানে ওকালতী করিতেন, তিনিও ব্রাহ্ম ছিলেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সমাজের প্রিয় ছাত্র বাবু গুরুদয়াল দাস গুপ্ত টাঙ্গাইল দ্বারকানাথ ডিসপেন্সারী ও হস্পিটালের

এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ছিলেন। সে স্থানের আপামর সাধারণ সকলে তাঁহাকে ভাল বাসিত, শ্রদ্ধা করিত। বাবু অনাথবন্ধু গুহ তখন কলিকাতা থাকিয়া কলেজে পড়িতেন, তথা হইতে মাঝে মাঝে তাঁহার আপন বাড়ী বেলতা গ্রামে আসিয়া ইঁহাদের সঙ্গে মিলিতেন। সাঁকরাইলের শিক্ষিত যুবকগণও যাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। ইঁহারা সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া সে অঞ্চলে কতকদিন খুব ধুম ধাম করিয়াছিলেন। তারপর কালীকুমার বাবু কালেক্টরীর হেডক্লার্ক হইয়া ময়মনসিংহ চলিয়া গেলেন, আমিও ডিষ্ট্রীক্ট হেডকোয়াটারে চলিয়া গেলাম সঙ্গে সঙ্গে টাঙ্গাইলের ব্রাহ্মসমাজও তখন উঠিয়া গেল।

১৯০১] বিষয় কর্ম্মের এবং জীবনেরও শেষভাগে ঘুরিয়া ফিরিয়া ফরিদপুর হইতে আবার ময়মনসিংহ জেলায় বদলী হইয়া আসিলাম এবং টাঙ্গাইল সবডিভিসনে প্রেরিত হইলাম। সেখানে যাইয়া পুরাতন বন্ধু বাবু মথুরানাথ গুহ স্কুল সব ইনস্পেক্টরকে পাইলাম। বৈষয়িক জীবনের মধ্যভাগে ইহাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে সম্মিলিত হইয়া অনেক সুখ সম্ভোগ করিয়াছি। ইনি বহুদিন পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজভুক্ত থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্পূর্ণ যোগ রক্ষা করিয়াছেন। যখন যেখানে রহিয়াছেন সেখানেই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে প্রাণ মন দিয়া খাটিয়াছেন এবং হিন্দু সমাজভুক্ত বহু লোক হইতে ব্রাহ্মসমাজের সাহায্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ইঁহার জীবনে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব বহুল পরিমাণে প্রবিষ্ট ও বিস্তৃত হইয়াছে। তিনি ক্রমে ক্রমে হিন্দু সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরিশেষে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইয়া ব্রাহ্ম সমাজ মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করিয়াছেন এবং তাহার পবিত্র প্রশান্ত ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন। ঠিক ৩০ বৎসর পরে টাঙ্গাইল যাইয়া দেখি কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যেস্থানে পূর্ব্বে বর্ষাকালে যমুনার জলরাশী ও

গ্রীষ্মকালে তাহার চড়ের বালীরাশী ধূ ধূ করিত এখন সেস্থানে প্রকাণ্ড বৃক্ষরাজি ফুলে ফুলে শোভা পাইতেছে, লোকজনের বাড়ী ঘর ও বাগ বাগিচাতে পূর্ণ হইয়াছে। যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে প্রায় সকলই হইয়াছে। আদালত ও ফৌজদারীর কাছারীর জন্য পাকা বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে, জেহেলখানাতে দালান ও প্রাচীর হইয়াছে, পাঁচ আনীর জমিদার বাবু দ্বারকানাথ রায়ের দাতব্য চিকিৎসালয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী বিন্দুবাসিনীর নামে উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় পাকা বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ছাত্রদিগের জন্য বোর্ডিং এবং সাধারণের জন্য রামেশচন্দ্র হল নামে টাউনহল নির্ম্মিত হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক অষ্ট্রেলিয়া মিসনের প্রকাণ্ড এক মিসন হাউস স্থাপিত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মসমাজের দুই শাখা নববিধান ও সাধারণ, উৎসাহের সহিত কায করিতেছে। পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীমান শশিভূষণ তালুকদারেব অকৃত্রিম যত্ন ও চেষ্টাতে এবং তাঁহার আদর্শ জীবনের দৃষ্টান্তে টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের নববিধান শাখা বিলক্ষণ উন্নতিলাভ করিয়াছে ও সুন্দররূপে কার্য্য-পরিচালনা করিতেছে। বাবু মথুরানাথ গুহ মহাশয়ের প্রযত্নে সমাজের অপর শাখাও যথেষ্ট উৎসাহের সহিত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, পাকা বাড়ীতে উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে সাপ্তাহিক উপাসনায় উপাস্থত উপাসকের সংখ্যা ও সন্তোষজনক ও আশাপ্রদ। এই সমাজের ব্রাহ্মবন্ধুদিগের সঙ্গে দুই বৎসর কাল পরম সুখে কাটাইয়া-ছিলাম। টাঙ্গাইলে আমাদের সমাজে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বোধ হয় কেহ ছিলেন না কিন্তু স্বনামখ্যাত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ও তাঁহার অনুগামী বাবু প্রসন্নকুমার বসুর জন্মস্থান টাঙ্গাইলের অতি নিকটে, তাঁহারা, বিশেষতঃ বাবু কৃষ্ণকুমার তাঁহার সুশিক্ষিতা ও উন্নত চরিত্রা কন্যাদিগকে লইয়া মাঝে মাঝে বাড়ী আশা উপলক্ষে যখন টাঙ্গাইল যাইতেন তখন

মন্দিরে উৎসব উপাসনা ও বক্তৃতাদি হইত, কখনও টাঙ্গাইলের বন্ধু সকলকে কৃষ্ণকুমার বাবু তাঁহার বাড়ীতে বাঘিল গ্রামে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন আমরা সেখানে যাইয়া উৎসব করিতাম। কত আনন্দ কত আহ্লাদ হইত!

পরিশিষ্ট।

(১) সেকালের রীতি নীতি।

সে কালে এদেশের জমিদারদিগের মধ্যে পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও আত্মীয়তার আদান প্রদানের প্রথা প্রচলিত ছিল না। প্রত্যেকেই আপন আপন বাড়ীতে বসিয়া আপনাকে খুব বড় লোক বলিয়া মনে করিতেন, অন্যের বাড়ীতে যাইতে অপমান বোধ করিতেন। গবর্ণর জেনেরেল লর্ড মেওকে যখন শেরালী নামক ওয়াহিবী আণ্ডামানে হত্যা করিয়াছিল, তখন সে জন্য ময়মনসিংহ সহরে এক শোক সভা হইয়াছিল, তাহাতে জমিদার তালুকদার হাকিম আমলা উকীল মোক্তার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই সম্মিলিত হইয়াছিলেন। জেলা স্কুলের মাঠে সামিয়ানা টাঙ্গাইয়া সভা করা হইয়াছিল। সেখানে সেরপুরের তিন আনীর জমিদার বাবু প্যারীমোহন চৌধুরী আসিয়াছিলেন। ইনি ছিলেন রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর। মুক্তাগাছার জমিদার ভ্রাতাদ্বয় বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ও অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ঐ সভায় প্যারী বাবুকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় আমোদ আপ্যায়ন করার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। প্যারী বাবু তাহা জানিতে পারিয়া তিনিও তাঁহার আপন আগ্রহ জানাইলেন। এখন বিষম সমস্যা হইল এই যে ইঁহাদের সম্মিলন হইবে কোথায়? মুক্তাগাছার জমিদার কি সেরপুরের জমিদারের বাসায় যাইয়া দেখা করিবেন? তাহাতে যে তাঁহাদের অপমান হয়। আবার সেরপুরের জমিদারই বা "ঘুইয়া ডোব দিতে" যাইবেন কেন? তাঁহার পক্ষেও তো মুক্তাগাছার বাসায় যাইয়া উপস্থিত হওয়া তেমনি আপত্তি

জনক। তখন উভয় পক্ষের উকিল মোক্তার পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে দুর্গাবাড়ীতে পুরান পাঠ ইত্যাদি একটা কিছু উপলক্ষ করিয়া জমিদার মহাশয়েরা সেখানে যাইবেন; সেটা তো ধর্ম্মসভা সকলেই যাইতে পারে। সেইখানে তাঁহাদের আলাপ পরিচয় হইয়া যাইবে এবং এইরূপে খট্‌কা ভাঙ্গিয়া গেলে পরে আর কাহারো বাড়ী যাইতে কাহারো কোন আপত্তি হইবে না। পরিশেষে সেইরূপই করা হইয়াছিল। তার পর তো কয়েকদিন পর্য্যন্ত মুক্তাগাছার উৎকৃষ্ট মণ্ডা ও সেরপুরের বিখ্যাত ছানা গোল্লার খুবই আমদানী সহরে হইল এবং উভয় বাসাতেই খাওয়া দাওয়া ও আমোদ আহ্লাদের ধুম চলিল।

(২) সেকালের জমিদার।

সেকালে এদেশে স্থলপথে রেলের গাড়ী ও জলপথে ষ্টীমার ছিল না। সুতরাং বিদেশে যাতায়াত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রীতি নীতি চাল চলন শিক্ষা করার প্রথা প্রচলিত ছিল না, বিশেষতঃ বড় লোকদিগের মধ্যে নিতান্তই বিরল ছিল। তাঁহাদের মধ্যে তীর্থ দর্শন অভিপ্রায়ে কদাচিৎ কেহ কখনও দূরদেশে যাইতেন কিন্তু সেও হইত এক বিরাট ব্যাপার। দুই একখানা বজরা, তাহার সঙ্গে দেশীয় অপেক্ষাকৃত ছোট নৌকা ৪।৫ খানা, তাহাতে পাইক বরকন্দাজ খানসামা বেহারা ২৫।৩০ জন লোক ঢাল তলওয়ার বন্দুক ও লাঠি ইত্যাদি সরঞ্জাম লইয়া, কর্ত্তা চলিতেন। যেখানে যাইয়া তাঁহার সেই নৌকার বহর উপস্থিত হইত সেখানকার লোকেরা ইহাই বুঝিত যে পূর্ব্ব দেশের খুব একটা বড় লোক যাইতেছেন। এই ভাবে একবার কোন এক জমিদার কাশী যাত্রা করিয়া ছিলেন। সুন্দর বনের ভিতর দিয়া তাঁহার নৌকার বহর চলিয়াছে এক

দিন নদীর ধারে নঙ্গর করিয়া নৌকা সকল রাখা হইয়াছে লোক জনেরা সকলেই প্রাতঃকৃত্য করিতেছে এমন সময় তাঁহাদেরই সঙ্গীয় একটা লোক "বাপ্‌রে, মারে, মার্‌লে রে", বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে ডাঙ্গা হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া নৌকায় উঠিল একবারে খোদ কর্ত্তার সম্মুখে। কর্ত্তা তাহা দেখিয়া সেই লোকটাকে খুব কয়েক ধমক দিয়া বলিলেন, "হতভাগা! আমার সঙ্গে ঢাল তলওয়ার বন্দুকও লাঠী সহ এত গুলি লোক রহিয়াছে তাহাতে দিন মাঝে তুই কাহার ভয়ে এত ভীত হইয়া এমন দৌড়িয়া আসিলি? তুই যেখানে ছিলি সেই ডাঙ্গায় থাকিয়া ডাক ছাড়িলি না কেন?" তখন সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে উত্তর করিল, "কর্ত্তা! আমি কি মানুষকে ডরাই? আমি এক চষা ক্ষেতে যাইয়া জলের ঘটী সাম্‌নে রাখিয়া যাই বসিয়াছি তখনি শুনিতে পাইলাম জঙ্গলের আড়াল হইতে খচ্‌ মচ খচ্‌ মচ করিয়া সব সুখান পাতা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যেন কি আসিতেছে। যাই বাহিরে আসিয়া চীৎকার দিয়া বলিল 'ধর শালাকে' আমি ভাবিলাম যে বাঘ আসিয়াছে তাই ঘটী ফেলিয়াই দৌড়িয়া আসিয়াছি।" তখন কর্ত্তা হইতে নৌকার মাঝী মাল্লা পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে এক হাসির রোল পড়িয়া গেল।

কর্ত্তাদের সঙ্গে যে সকল লোক চলিত তাহাদের অধিকাংশেরই বুদ্ধি থাকিত ঐরূপ। তীর্থ স্থানে যাইয়াই কি কোন শিক্ষিত সভ্য ভব্য লোকের সহিত সাক্ষাৎ কবিতেন? অর্থগৃধ্নু স্বার্থপর চাটুকার লোক আসিয়া ইহাদের কাছে উপস্থিত হইত এবং নানা প্রকারে তোষামোদ করিয়া যথা সাধ্য টাকা লুটিয়া লইত। কর্ত্তা মহারাজের ন্যায় বড় লোক পুণ্যবান ও দয়াল আর সচরাচর দেখা যায় না ইত্যাদি চাটুবাক্যে কর্ত্তার মন গলাইয়া ফেলিত, তিনি মুক্তহস্তে সকলকে দান করিতেন আর জয় জয়কার পড়িয়া যাইত। এই ভাবে দেশ পর্য্যটন দ্বারাও ইঁহাদের

চক্ষু ফুটিত না বরং 'হাম বড়া ও নন্‌লাইকৃমি' ধারনাটাই পরিপুষ্ট হইয়া আসিত।

আপন আপন বাড়ী বসিয়া কর্ত্তারা কেবল সম্মানই পাইতেন বই কাহাকেও সম্মান করিতে অভ্যস্থ ছিলেন না। শুধু রায়ত খানসামা ও আমলা উমেদারের সঙ্গে আলাপ ব্যবহারে সম্মান করার প্রয়োজন হয় না সুতরাং সেকালের কোন কোন কর্ত্তার কাছে কখনও কোন বাহিরের ভদ্রলোক যাইয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকেও সম্মান সূচক বাক্যে সম্বোধন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন অথচ আপন অধীনস্থ লোকদিগকে যেরূপ অবজ্ঞার সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সেরূপ করাটাও ভব্যতার বহির্ভূত হয়, তাই কেহকে 'তুমি', বা 'আপনি', কিছুই না বলিয়া ভাববাচ্যের প্রয়োগ সকল অবলম্বন করিতেন, যথা—নাম কি, বাড়ী কোথায়, কি কাজ করা হয়, বেতন কত, কোথায় যাওয়া হইবে, কি জন্য আসা হইয়াছে ইত্যাদি। ইহার একটুকু নমুনা আমি নিজেও একবার দেখিয়াছিলাম।

কোন এক মোকদ্দমার তদন্ত উপলক্ষে একজন সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীর জবানবন্দী করা আবশ্যক হইয়াছিল, সে জন্য আমি তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। আমরা তাঁহার বাহির বাড়ীর বৈঠক খানায় যাইয়া বসিয়া অন্দর বাড়ীতে কর্ত্তার কাছে সংবাদ পাঠাইলাম। তিনি অবিলম্বেই বাহিরে চলিয়া আসিলেন। তিনি এজন্য প্রস্তুতই ছিলেন নচেৎ এত সহজে পুলিসের সাক্ষাতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন না। তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "দারোগা কোথায়?" আমরা ফরাসে বসিয়াছিলাম; তিনি একখানা চেয়ারে বসিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "দারোগা কোথায়, দারোগা কোথায়?" বোধ হইল তিনি যেন প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে

শৃঙ্গ পুচ্ছ বিশিষ্ট একটা ভয়ানক জন্তু অথবা লোহিত উষ্ণীষধারী একটা ভীষণ পুরুষ দারোগারূপে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে। আমি তো সেই ভাব স্বভাব দেখিয়া অবাক হইলাম। মোক্তার বাবু আমাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন "ইনিই ইন্‌স্পেক্টার বাবু"; অমনি আর কোন কথা বার্ত্তা নাই, আমার উপর প্রশ্ন হইল "প্রয়োজন?" এবার আমার হাসি সম্বরণ করা কষ্টকর হইয়া পড়িল, চাদর মুখে ঠাসিয়া ধরিয়া কোনও-রূপে সামলাইয়া তবে ঐ প্রশ্নের উত্তর করিলাম। আমি তাঁহার কাছে যাহা জানিবার জন্য গিয়াছিলাম তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি উত্তর করিলেন, "অস্মদের তাহা অবগত নাই"। এই উত্তর শুনিয়া হাসি আর চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। এমন ভাষাও আর কোন দিন শুনি নাই, বাক্যালাপের এমন ধরণও আর কোনখানে দেখি নাই। যাহা হউক, হাসির উচ্ছাস যথা সম্ভব সংযত করিয়া নানা প্রকারে সেই বিষয়টি তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু বার বারই সেই এক গত-বাঁধা উত্তর, "অস্মদের তাহা অবগত নাই"। তিনি মনে করিলেন যে তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন না, কিন্তু সত্যের অপলাপ করিয়া তিনি যে সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদীর অপরাধটা করিলেন তাহা মনে করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম।

ঢের দিন হইল এরূপ রীতি নীতি ও চাল চলন তিরোহিত হইয়াছে। যে সকল প্রাচীন ভূম্যধিকারীগণ ঐরূপ করিতেন তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদি বংশধরগণ এখন শিক্ষা ও সভ্যতাতে সমাজের ও দেশের শীর্ষ স্থান অধিকার করিতেছেন, তাঁহাদের শিষ্টাচার ও বিনয় নম্র ব্যবহার, তাঁহাদের ভদ্রতা ও সৌজন্য সকলের আদর্শ স্থানীয়। ইহাঁরা এখন সেই সকল প্রাচীন কাহিনী শুনিলে হাসিয়া খুন হন।

---

(৩) সেকালের পল্লীচিত্র।

আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি পল্লীগ্রামে প্রত্যহ অপরাহ্নে প্রাচীন ভদ্রলোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি মণ্ডপ ঘরের রোয়াকে বসিয়া কিম্বা ফুলবাগানে প্রকাণ্ড কাঞ্চন ফুলের বা বকুল ফুলের গাছতলায় বসিয়া রামায়ণ কি মহাভারত পাঠ করিতেন আর গ্রামের যত প্রাচীন প্রাচীনার দল সেখানে বসিয়া তাহা শুনিতেন, কেহ বা মালা জপ করিতেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ শূদ্র কামার কুমার তিলী ছুতার নাপিত ধোপা প্রভৃতি সকলেই একত্রে মিলিত,—কোন জাত বিচার ছিল না। এইরূপে যাহারা ধর্ম্মকথা ও সৎপ্রসঙ্গ শুনিবার জন্য একত্রিত হইত তাহাদের মধ্যে একটা ধর্ম্মের বন্ধন ও পবিত্র আকর্ষণ জন্মিয়া যাইত। তার পর সেকালে গ্রামে গ্রামে এক একটা দেবালয় বা আখড়া থাকিত তাহাতে কোন বিগ্রহের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিত, সেখানে "বারো মাসের তের যাত্রা" অর্থাৎ যে সময়ের যে পূজা পার্ব্বণ তাহা তো হইতই তা ছাড়া মাঝে মাঝে মহোৎসব হইত; তখন গ্রামের আপামর সর্ব্বসাধারণ আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া যাইত। আমাদের নিজ পল্লীতে গঙ্গাদাস বাবাজীর এক আখড়া ছিল সেই দেবালয়ে ঊষাকীর্ত্তন ও সন্ধ্যা আরতি, তৎপর নাম গান হরির লোট ও সংকীর্ত্তন উপলক্ষে গ্রামের প্রাচীন প্রৌঢ় যুবক ও বালকবৃন্দ সকলে সমবেত হইয়া "আচণ্ডালে প্রেম বিলাইয়া" কতই আনন্দ উপভোগ করিত! প্রতি গ্রামেই এইরূপ সর্ব্বসাধারণের সম্মিলন স্থান এক একটা থাকিত। একালের ন্যায় সভা সমিতি ও বক্তৃতা ছিল না বটে কিন্তু সেই গ্রাম্য পার্লিয়েমেণ্টের মহা সভায় মিমাংসিত না হইত এমন কোন্ বিষয়ই ছিল না। ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে যেমন সকল প্রকার প্রশ্নের বিচার ও শাসন সমাধান হইত তেমনি দেশহিতকর ও লোকহিতকর

কার্য্যের ব্যবস্থা ও বিধি বন্দোবস্ত সেখান হইতেই হইত। সেকালে লোকেলবোর্ড বা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড কিছু ছিল না, কিন্তু গ্রামের পথ ঘাট ব্যবহারোপযোগী করিয়া রাখার বন্দোবস্ত গ্রামিক লোকেরাই করিত; তাহাতে কাহারো কোন ত্রুটি প্রকাশ পাইলে কিম্বা একের কার্য্য বা অকার্য্যে অপরের কোন অসুবিধা উপস্থিত হইলে তাহার বিচার ও প্রতিকারের ব্যবস্থা সেই গঙ্গাদাস বাবাজীর আখড়ার ছায়ামণ্ডপে বসিয়াই হইত, কোন আইন আদালতের আশ্রয় লইয়া নোটিস বা ইন্‌জাংসন বাহির করিতে হইত না। সেকালে গ্রামে গ্রামে যে ভলানটিয়ারের (Volunteers) দল ছিল তাহাদের কথা স্মরণ করিলে এখনও প্রাণ পুলকে পরিপূর্ণ হয়। এই ইংরেজী নামে তাহারা অভিহিত হইত না, এই নাম অথবা স্বেচ্ছা সেবক প্রভৃতি আখ্যাও কেহ জানিত না কিন্তু প্রতি পল্লীতে একদল যুবক থাকিত যাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কোন চিন্তা করিতে হইত না এবং যাহাদের কোনরূপ শারীরিক সাহায্য ব্যতীতই তাহাদের আপন আপন সংসারের কাজ চলিয়া যাইত। এই যুবকদের কাজ ছিল মাঠে মাঠে ছুটাছুটী করিয়া ডাণ্ডা গুলি খেলা, নানা প্রকারের মল্লক্রীড়া ও ব্যায়াম করা এবং সর্ব্বদা পরের কাজে আপনাদিগকে নিযুক্ত করা। গ্রামে বারোইয়ারী পূজা বা গাহানের অনুষ্ঠান হইলে ইহারা কোমর বান্ধিয়া তাহাতে লাগিয়া যাইত এবং রাত্রি জাগিয়া ও দিনে খাটিয়া সে ব্যাপার সুনির্ব্বাহ করিয়া দিত। কোন বাড়ীতে কাহারো উৎকট পীড়া হইলে ইহারা সেখানে যাইয়া সুশ্রূষার কাজে লাগিয়া যাইত। ইহারা দুর্ব্বলের উপর বলবানের অত্যাচার দেখিতে পারিত না, কোথাও সেরূপ কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ সেস্থানে যাইয়া নিপীড়িতের পক্ষ সমর্থন করিত এবং উৎপীড়নকারীকে নির্য্যাতন করিত। সেকালে গ্রামে গ্রামে গোচারণের মাঠ ছিল তাহাতে

গ্রামস্থ লোকদের গরু ঘোড়া অবাধে ও অরক্ষিত ভাবে চরিয়া বেড়াইত এবং সমস্ত দিন প্রচুর পরিমাণে ঘাস খাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়া সায়ংকালে আপন আপন বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইত। উল্লিখিত যুবকেরা মাঠ হইতে যে যাহার ঘোড়া ইচ্ছা ধরিয়া বেদম দৌড়াইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে; দুগ্ধবতী গাভী ধরিয়া দোহাইয়াছে এবং মাঠেই সে কাঁচা দুধ খাইয়া ফেলিয়াছে; সেজন্য কদাচিৎ কখনও মিষ্ট ভৎর্সনা হইলে তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। দোলযাত্রা উপলক্ষে হোলি গাহান ও আবির কুম্‌-কুমের খেলাতে মুসলমানেরা পর্য্যন্ত আসিয়া হিন্দুদিগের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। শৈশব কালে আমরা আবির খেলিয়া কত মুসলমানের পাকা দাড়ি লাল করিয়া দিয়াছি। যেমন হোলি গাহানে তেমনি ঘাঁটু ও কবি গাহানে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে মেলা মেশা হইত এবং মুসলমানেরাও হিন্দুদিগের সঙ্গে গান বাদ্য করিয়া প্রাণ খুলিয়া আমোদ আহ্লাদ করিত। হায় হায়, বাঙ্গলা দেশের পল্লীগ্রামের সেই মনোমুগ্ধকর চিত্র সকল কোথায় চলিয়া গেল! যেখানে মাসে মাসে, দিনে দিনে, নানাবিধ আমোদ আহ্লাদ ও উৎসবের আনন্দ কোলাহল সর্ব্বদা দেখিতে পাইতাম সেখানে এখন বৎসরে একবার কি ২।৩ বৎসরের মধ্যেও একবার তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন কি গ্রামে গ্রামে বালক জন্মে না? তাহারা কি উৎসাহ উদ্যমশীল যুবক হয় না? তবে আমাদের সেই সেকালের ন্যায় ভলানটিয়ারের দল গঠিত হয় না কেন? এখন কি গ্রামে প্রাচীন প্রাচীনারা থাকে না? কিন্তু ধর্ম্মপুস্তক পড়িবার বা ধর্ম্মকথা শুনাইবার লোক তো দেখিতে পাই না অথবা সৎ প্রসঙ্গ ও নীতি কথা শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত লোকও তো দেখা যায় না। এখন আর সেই গঙ্গাদাস বাবাজীর আখড়ার ন্যায় দেবালয় গ্রামে গ্রামে দেখা যায় না। প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে, গ্রাম মধ্যে আর সর্ব্বসাধারণের মিলিত

হইবার সেরূপ স্থান নাই। থাকিলেই কি হইবে? দেশের অবস্থা নানা দিকেই বিষম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে লোকের প্রকৃতিও ঘোরতর রূপে বিকৃত হইয়াছে। এখন কথায় কথায় সামলাধারী বিগ্রহগণের কাছে ছুটাছুটী, পাড়ায় পাড়ায় লাল পাগড়ীর হাঁটাহাঁটি এমনি অভ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছে যে সরকারের বিনা হুকুমে গ্রামস্থ লোকের আপনা আপনার মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া কাজ কর্ম্ম সারিয়া লওয়ার প্রথাই আর ভাল লাগে না।

এখন মফঃস্বলের মাঠ দিয়া স্থল পথে কি জলপথে চলিয়া যাইতে পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীগ্রাম হইতে সন্ধ্য ঘণ্টা ও কাশী কাশরের বাদ্য ধ্বনি অথবা মৃদঙ্গ করতালের তালে তালে সঙ্গীত ধ্বনি আর শুনা যায় না। বিষম এক বিষাদ ও নিরানন্দের ছায়া পড়িয়া দেশটাকে যেন ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, কোনও উৎসাহ উদ্যমের স্ফুর্ত্তি নাই, আনন্দ আহ্লাদের কোলাহল নাই। দেশের এই অবস্থা, এই শোচনীয় অবস্থা কেন হইল কে বলিবে? আবার দেশের সেই পূর্ব্ব অবস্থা হইবে কি না, কলিযুগের পর আবার সে সত্যযুগ আসিবে কি না কে বলিতে পারে? এই কলিযুগের দুর্ভোগ কবে পূর্ণ হইবে, তবে সত্যযুগ আসিবে তাহা কি কেহ বলিতে পারে? "আসিবে সেদিন আসিবে" বলিয়া যে আমরা আশায় বুক বান্ধিবার চেষ্টা করি তাহা কোন্ দেবতার ছলনা কে জানে?

(৪) সেকাল ও একাল।

কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতে অনেক সময়ে কঠোর হইতে হয়, দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে হয়, নতুবা ন্যায়পরতার সম্মান থাকে না; কিন্তু একবারে নিষ্ঠুর অভদ্র ও অসভ্য না হইলে যে চলে না তাহা আমি স্বীকার

করি না। দস্যু তস্কর বা চোর বলিয়া কেহকে ধরিয়া আনিলে সকলেই তাহাকে মারিতে চায় ও গালাগালি দেয়; এমন কি তাহার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার না করিলে যাহার বাড়ীতে চুরি হইয়াছে, তিনি তো হাজার শিক্ষিত ও পণ্ডিত হইলেও পুলিসের উপর চটিয়া যান। কিন্তু দস্যু তস্করের ভিতরেও যে প্রাণ আছে, কোমলতর বৃত্তি সকল আছে, তাহা ধরিয়া কাজ করিতে পারিলে যে কত সুফল লাভ করা যায় সে দিকে অতি অল্প লোকেরই মতি গতি ধাবিত হয়। যাহারা কোন দিন কাহারো কাছে মিষ্ট ব্যবহার পায় না, কখনও কোন ভাল কথা শুনিতে পায় না, তাহাদিগকে যদি কোন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি শাসন না করিয়া মিষ্ট সম্ভাষণ করে বা সদুপদেশ দেয়, তাহাদের দুঃখের কথা অভাবের কথা মন দিয়া শুনে, তাহা হইলে দেখিয়াছি অনেক দস্যু তস্করও একেবারে গলিয়া যায় এবং হাউ হাউ করিয়া কান্দিতে থাকে।

কোন এক স্থানের এক গবর্ণমেণ্ট আপিস হইতে প্রায় দুই হাজার টাকা পরিমাণের করেন্‌সি নোট ও নগদ টাকা চুরি গিয়াছিল। সেই চুরি মোকদ্দমার তদন্ত কার্য্যের ভার আমার উপরে ন্যস্ত হইলে আমি ঘটনাস্থলে যাইয়া অবস্থা অবগত হইলাম এবং রীতিমত তদন্ত করিতে লাগিলাম। সেই আফিসের প্রধান অধ্যক্ষ যিনি, তিনি কলিকাতা ইউনিভারসিটীর একজন এম্‌-এ, বি-এল্‌ ও সুশিক্ষিত লোক, স্থানীয় আরো অনেক শিক্ষিত লোকই তাঁহার পক্ষে থাকিয়া আমার কাজের সহায়তা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু দেখিলাম আমি তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছি না। অবস্থা অনুসারে সেই আপিসের পাহারায় নিযুক্ত লোকদিগের মধ্যেই কেহ এই চুরি করিয়া থাকিবে বলিয়া সন্দেহ হইল, কিন্তু পাহারার কাজে নিযুক্ত লোক একজন নয়, দুইজন নয়, বহু। সেই অনেকের মধ্যে কে এই কার্য্য করিয়াছে তাহা নির্দ্দেশ

করিতে পারিতেছি না। ক্রমাগত ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত তদন্ত করিয়া কোন কিনারা করিতে পারিলাম না দেখিয়া সকলে নিরাশ হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই অভিপ্রায় এই যে পাহারার প্যাদা সবগুলিকে বান্ধিয়া যেন সমানে পিটান হয়। তাহা হইলে প্রকৃত অপরাধী কে উহারাই বলিয়া দিবে। কিন্তু আমার সেরূপ প্রবৃত্তি নাই দেখিয়া এবং আমাদ্বারা তদ্রূপ কিছু করান সম্ভবপর হইবে না দেখিয়া প্রকাশ্যে ঐরূপ প্রস্তাব কেহ করিলেন না। ভদ্রতা রক্ষা করিয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন, "না, সেকেলে দারোগা না হইলে এ সব কাজ হয় না; আপনাদের এ সব কাজ নয়" ইত্যাদি। আমি নীরবে এই সকল মন্তব্য শুনিতে লাগিলাম এবং নীরবেই আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে লাগিলাম। যখন নিজের স্বার্থ উপস্থিত হয়, তখন উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত সুসভ্য ভদ্রলোকেরাও কিরূপ বিবেকশূন্য ও ন্যায়ান্যায় বিবেচনাশূন্য হইয়া পড়েন তাহা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু আমি নিজে আপন কর্ত্তব্যভ্রষ্ট বা নিরাশ নিরুদ্যম হইলাম না। তদন্তের কাজ যথাসম্ভব চালাইতে লাগিলাম এবং বলিলাম যে, "যে যে পন্থা চেষ্টা করিয়া দেখা আমি উচিত মনে করি সে সকল দেখা শেষ হইলে পর আমি এই মোকদ্দমা কোন 'সে-কেলে দারোগার' জন্যই রাখিয়া এ স্থান হইতে চলিয়া যাইব।" জগদীশ্বরের অভাবনীয় কৃপায় ৮।১০ দিন তদন্তের পর সেই মোকদ্দমা আস্কারা হইয়া পড়িল। প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়িল এবং তাহার প্রদর্শন অনুসারে জঙ্গলাকীর্ণ স্থান হইতে লুক্কায়িত অপহৃত নোট ও থলিয়া সহ টাকা সকলই উদ্ধার করা হইল। তখন সে স্থানে আনন্দ কোলাহলের আর সীমা রহিল না। জঙ্গলমধ্যে অপহৃত মাল বাহির হওয়া মাত্র সেই সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে চারিদিকে ছুটিয়া গেল আর কাহারও জন্য কেহ অপেক্ষা না করিয়া সকলে দৌড়িয়া সেখানে উপস্থিত

হইল। সেই এম্-এ, বি-এল্ বাবু স্নান করিতে যাইয়া গায় সাবান মাখিতেছিলেন; সেই সাবান হাতে করিয়াই চলিয়া আসিলেন; কেহ স্নানান্তে পূজা করিতে যাইতেছিলেন, তিনি পূজা ফেলিয়াই দৌড়িয়া আসিলেন। কেহ খড়ম পায় কেহ খালি পায়, কেহ গামছা মাথে কেহ ছাতা হাতে হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমার কাছে সমুপস্থিত। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল লোকের উল্লাস ধ্বনিতে আকাশ পরিপূর্ণ হইল। এম্-এ, বি-এল্ ও বি-এ, বি-এল্ প্রভৃতি সকলে আমার (হ্যাণ্ড সেক) করমর্দ্দন করিয়া কত ধন্যবাদ দিলেন। সকলের সুর একবারে বদ্‌লিয়া গেল এবং "সে-কেলে দারোগার" কেবলই নিন্দাবাদ চলিতে লাগিল।

যে ব্যক্তি এই চুরি করিয়াছিল সে পাহারাদারদিগেরই একজন। সরকারি তহবিলের ঐ টাকা ও নোটগুলি এমনি অসতর্কভাবে রাখা হইয়াছিল যে তাহা সরাইয়া ফেলিতে বড় একটা ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় নাই। এতগুলি টাকা অতি সহজে আত্মসাৎ করা যায় এ কি সামান্য প্রলোভন? ঐ ক্ষুদ্র বেতনের অশিক্ষিত একটি লোকের মনে এই প্রবল প্রলোভন কিরূপ আধিপত্য করিয়াছিল, তাহার সহিত সেই অসাবধান কার্য্যকারক যে অসতর্কভাবে তহবিলের নোট ও টাকা সকল রাখিয়াছিল তাহা এবং পরে অপরাধী তাহার অন্যায় বুঝিতে পারিয়া যে সরলভাবে সমুদয় স্বীকার করিয়া অপহৃত সম্পত্তি বাহির করিয়া দিয়াছে এবং তাহার কিছুমাত্র অপচয় বা খরচ হয় নাই, এই সকল কথা বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বুঝাইয়া বলাতে তিনি লঘুদণ্ডের আদেশ করিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি এবং তাহার পিতা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছিল এবং আপীল করে নাই।

কলিকাতা ইউনিভারসিটীর একজন আণ্ডার গ্রেজুয়েট (ফোর্থ ইয়ার্ ক্লাসের ছাত্র), সব্ ইন্‌স্পেক্টারী পরীক্ষা পাশ করিয়া পুলিসের কাজে

প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি, একদিন আমি শুনিতে পাই এমন স্থানে দাঁড়াইয়া একটা লোককে অতি কদর্য্য অশ্লীল ও অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিলেন তাঁহার পরিবারস্থ মেয়েরা পর্য্যন্ত তাহা শুনিতে পাইল। আমি বুঝিতে পারিলাম যে সব্ ইনস্পেক্টার বাবুর উদ্দেশ্য এই যে আমাকে বুঝিতে দেন যে পুলিসের কাজে তিনি খুব পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। ভদ্র সন্তানেরা স্কুল কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সহসা যাহা শিখিতে পারে না তিনি তাহা বিলক্ষণ শিখিয়াছেন। যুবকের এই কার্য্য দেখিয়া ব্যথিত হইলাম এবং তাঁহার একটি আত্মীয় দ্বারা তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলাম। সেই আত্মীয়টি তখনও কলেজে পড়িতেছে তাহার স্বভাব অতি কোমল ও চরিত্র নিতান্ত নির্ম্মল। সব্ ইনস্পেক্টার নিকটে আসিলে তাঁহাকে বলিলাম যে আমি যখন যে থানায় কাজ করিয়াছি তখন সেই থানার দারোগা জমাদার কি কনেষ্টবলকেও কোন ভদ্রলোকের শ্রুতি গোচর স্থানে কেহকে অশ্লীল গালাগালি করিতে দেই নাই, অথচ আমি অনেক অনেক মোকদ্দমা আস্কারা করিয়াছি ও অপরাধীকে ধরিয়া চালান দিয়া শাস্তি দেওয়াইয়াছি। গালাগালি করার ঐ কদর্য্য অভ্যাস একবার অভ্যস্থ হইলে তাহা আর ছাড়ান যায় না। পরে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী ও স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতির সাক্ষাতে ঐ সকল বচন আওড়াইতে আর সঙ্কোচ বা লজ্জা বোধ থাকে না। ফল এই হয় যে শেষকালে আর মার্জ্জিত রুচির সভ্যসমাজে যাইয়া বসিতে ও বাক্যালাপ করিতে পারা যায় না, কারণ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্বেও অভ্যস্ত বচন সকল বাহির হইয়া পড়ে। সেই বুদ্ধিমান যুবক আমার কথা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং বলিলেন যে, "পুলিসে আসিয়া অবধি এরূপ উপদেশ আর কখনও কাহারও মুখে শুনি নাই। কেবলই শুনিয়াছি যে পুলিসে কাজ করিতে হইলে পাজী না হইলে

চলে না, এবং খ্যাতনামা প্রাচীন দারোগা যে ২।১ জনের অধীনে কাজ করিয়াছি তাঁহাদিগকে যাহা করিতে দেখিয়াছি তাহাই শিখিয়াছি। আজ হইতে আপনার উপদেশ অনুসারে কাজ করিব।”

কথায় বলে, “দোষে গুণে সংসার”—সে নিতান্ত সত্য কথা। কেহই একেবারে দোষশূন্য নহে, কোন না কোন দোষ প্রত্যেকের মধ্যেই দেখা যায়; আবার এককালে গুণহীন সর্ব্বপ্রকার সদ্ভাব বিবর্জ্জিত নির্গুণ পদার্থও দেখা যায় না। সে কালের দারোগারা অশিক্ষিত ও অত্যাচারী ছিল—তাহাদের অনেকেই সুরাপায়ী ও বেশ্যাশক্ত হইত কিন্তু তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থ নানা সৎকাজে ব্যয়িত হইত—তাহারা কত দরিদ্রের ভরণ পোষণ করিত, কত অনাথ বালকের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিত, কত অনাথা বালিকার বিবাহের খরচ নির্ব্বাহ করিত। সর্ব্বদা অতিথি অভ্যাগতের সেবা এবং মাসে মাসে বর্ষে বর্ষে গরীব আত্মীয় কুটম্বের সাহায্য করা, তাহারা কর্ত্তব্য বলিয়া মানিত। একালের শিক্ষিত এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ দারোগাদিগের মধ্যে সেকালের ন্যায় পানদোষ ইন্দ্রিয় দোষ ও অত্যাচার প্রবৃত্তির বিলোপ হইয়াছে বটে কিন্তু উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যয় সেকালের তুলনায় বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবেনা। “পরোপকারায় সতাং জীবনম্” এই মন্ত্রের প্রয়োগ সেকালের “অসতাং”দের জীবনে বরং দেখিয়াছি কিন্তু একালের “সতাং”দের জীবনে তাহা দেখিতে পাই না। এ মন্তব্য যে শুধু দারোগা-দিগের উপরেই প্রযোজ্য তাহা নহে, পরার্থপরতা একালে আর আপামর সাধারণের মধ্যে তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। অতিথি অভ্যাগতের প্রতি শ্রদ্ধা, আত্মীয় কুটম্ব ও প্রতিবেশী প্রতিপালনে অনুরাগ ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। আমাদের পল্লীতে লোচন ঠাকুর (রাম লোচন লগ্নাচার্য্য) নামে একজন সাত্ত্বিক হিন্দু ছিলেন, তিনি সর্ব্বদা হরিনাম

কীর্ত্তন করিতেন ; সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি একদিন আমাদের বাড়ীতে কার্য্যোপলক্ষে আসিয়াছিলেন, তখন কথা প্রসঙ্গে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে বলিলেন, “বাবা, কাল বাড়ী বসিয়াই ভাল কিছু রুই মাছ কিনার পরেই মনে হইল আহা এমন সুন্দর সুখাদ্য মাছটা যুটিল আর যদি ২।১টী অভ্যাগত লোক পাইতাম তা হলে বড়ই সুখী হওয়া যাইত। বাবা! গোবিন্দের কি ইচ্ছা, তখনই একটি এবং তাহার কিছুকাল পরেই আরো দুইটি কুটুম্ব আসিয়া উপস্থিত ; দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। সেই রুই মাছে ঝোল, ভাজি, অম্বল, প্রভৃতি রান্না হইল, আমরা সকলে ভোজন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলাম।” আমি তখন স্কুলের বালক, লোচন ঠাকুর প্রাচীন লোক। সেই বৃদ্ধের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহার প্রাণ মন কিরূপ সরল উদার ও প্রশস্ত তাহা ভাবিয়া যে বিপুল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম তাহা অদ্যাপি, জীবনের এই শেষ ভাগেও, উজ্জ্বলরূপে হৃদয়ে জাগ্রত রহিয়াছে। লোচন ঠাকুরের মত অপ্রত্যাশিত অতিথির আগমনে আহ্লাদিত হয়, ঘরে একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইলে তাহা পরকে না দিয়া শুধু নিজে খাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে না, এমন লোক তো একালে আর বড় দেখা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে বরং দেখা যায় কাহারো বাড়ীতে কোন ভোজের আয়োজন হইলে যদি নিমন্ত্রিত নির্দ্দিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত ২।১টি লোক অতিরিক্ত উপস্থিত হয় তাহা হইলে কর্ম্মকর্ত্তার মুখ মলিন হইয়া পড়ে ; এষ্টিমেট ছাড়িয়া গেল বলিয়া গিন্নী চিৎকার করিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলেন।

ময়মনসিংহে ডাক্তার ও ডাক্তারী চিকিৎসা।

এদেশে কুইনাইন প্রচলিত হইলে পর আমরা দেখিলাম ইহা জ্বর রোগের এক চমৎকার ঔষধ—আমরা তখন স্কুলের বালক। জ্বর ছাড়িবা মাত্রই কতকগুলি কুইনাইন খাইয়া ফেলিতাম, তারপর আর "জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং, জ্বরান্তে লঘু ভোজনং" ইত্যাদি কোন বিধি ব্যবস্থার ধার ধারিতাম না। দুধ, ভাত, মাছ, মাংস অবাধে চালাইয়া দিতাম। সেকালের প্রাচীন অভিভাবকাভিমানী ব্যক্তিগণ এ সকল ভালবাসিতেন না। তাঁহারা আমাদের রোগের অবস্থায় রাত্রি ১০টা। ১১টার কালে সাগু বার্লী খাইতে দেখিলে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন "ইংরেজী পড়িলে কি হইবে, বাড়ী তো ইংলণ্ডে নয়?" কিন্তু যখন দেখিতেন আমরা কুইনাইন খাইয়া এবং ঐরূপ ব্যভিচার করিয়াই জ্বর তাড়াইয়া দিতেছি তখন তাঁহারা কতকটা বিষণ্ণ ও কতকটা বিস্মিত হইতেন। সেকালে ময়মনসিংহ সহরে বাবু শ্রীকান্ত চক্রবর্ত্তী ছিলেন এক মাত্র ডাক্তার। তিনি অতি সচ্চরিত্র এবং নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট থাকিত কিন্তু কোন প্রাচীন লোকের সাক্ষাতে তিনি দুধ খাওয়ার ব্যবস্থা দিতে সাহস করিতেন না।

১৮৬৮ কি ১৮৬৯ সনে বাবু বরদা চরণ বসু ডাক্তার আসিয়া এক ডিস্‌পেন্সারী খুলিলেন এবং ছাপান লেবেল আঁটা শিশিতে করিয়া ঔষধ বিক্রী করিতে লাগিলেন। লেবেল মধ্যে ছাপান থাকিত "B. C. Bose & Co." "বোতল ঝাঁকিয়া লও"; এই সকল নূতনত্ব দেখিয়া কত লোকের তাক লাগিত। তাহার পর বাবু সারদাকান্ত দাস, বাবু উমেশচন্দ্র সেন, বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত ও বাবু তারানাথ বল প্রভৃতি অনেক ডাক্তার ক্রমে ক্রমে সহরে আসিয়া যুটিয়া ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ডাক্তার উমেশ

সেন খুব বাবু ছিলেন ও তাঁহার চাল চলনে একটু বড়মানুসাতি ধরণ থাকিত। তাঁহার যাতায়াত ও চিকিৎসা ব্যবসায় অধিকাংশ স্থলে জমিদারদিগের বাড়ীতেই আবদ্ধ থাকিত। দ্বারকা বাবুও সহরে দীর্ঘকাল ডাক্তারী করিতে পারেন নাই। সারদা বাবু যেমনি প্রিয়দর্শন তেমনি মিষ্টভাষী ও আমোদপ্রিয় ছিলেন। ইংরেজী ও বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল ও সর্ব্বদা তাহার অনুশীলন করিতেন। উদার প্রাণ ও সরল হৃদয় লইয়া তিনি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সসম্মানে ও সসম্ভ্রমেই তাহা উদ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। রাজা জমিদারের প্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া নিতান্ত দরিদ্রের পর্ণকুটীরেও সারদা বাবুকে দেখা যাইত। ব্রাহ্মসমাজের নেতা বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয় সারদা বাবুর আত্মীয় ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মসমাজ সংস্পৃষ্ট সকল লোককে তিনি বিনা ভিজিটে চিকিৎসা করিতেন। তা ছাড়া দরিদ্র ছাত্র এবং অপর দুরবস্থাপন্ন অনেক লোককে সারদা বাবু বিনা মূল্যে ঔষধ ও ব্যবস্থা দিয়া চিকিৎসা করিতেন। বাবু তারানাথ বল একজন স্বাধীন চেতা, সৎসাহসী ও উচিতবক্তা লোক। তাঁহার ডাক্তারী ব্যবসায়ের প্রসার সারদা বাবুর মতই বিস্তীর্ণ ছিল। রাজার রাজপ্রাসাদে ও মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকের বাটীতে ইঁহার যেমন ডাক ছিল দুঃখী দরিদ্র ও গরীবের রুগ্ন শয্যায়ও তেমনি। ডাক্তারী ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি জন সাধারণের হিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা লিপ্ত হইতেন। কমিসনার রূপে মিউনিসিপালিটীতে কিম্বা মেম্বর রূপে কোন স্কুলের কমিটীতে অথবা অন্য কোন পবলিক মিটিং মধ্যে যখন যেখানে উপস্থিত রহিয়াছেন তখনই সেখানে স্বাধীনভাবে আপন কর্ত্তব্য সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য অনেক স্থলে অনেকের সঙ্গে বাদ বিষম্বাদ করিতে হইয়াছে, কিন্তু সে জন্য তিনি কাহারো ভ্রূভঙ্গির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন কর্ত্তব্যের পথে অটল

রহিয়াছেন। শেষকালে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে আন্দোলনকারী বালক ও যুবক দলের পক্ষ সমর্থন ও তাহাদের সাহায্য করিতে যাইয়া অনেক নিগ্রহ ও নির্য্যাতন পর্য্যন্ত সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যাত্রাগাহান ও ভাটের কবিতা।

প্রতি বৎসর শীতকালে সহরে যাত্রার দল আসিত এবং ২।৩ মাস ভরিয়া বাসায় বাসায় গাহান করিয়া নগরের সর্ব্বসাধারণকে আমোদ যোগাইত। বনাচারী ও গোবিন্দ নট এই দুই দলপতির নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। বনাচারী গায়িত "রামের বনবাস" ও "শ্রীরাধার মান ভঞ্জন"। দলের অধিপতি প্রৌঢ় বনাচারী যখন দাড়ী গোঁফ চাঁচিয়া ফেলিয়া নিজে বৃন্দা দূতী সাজিয়া আসরে উপস্থিত হইত তখন দর্শকেরা প্রথমে একটু হাসিত, কিন্তু পরে তাহার গান শুনিয়া ও অভিনয় দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইত। কৃষ্ণকমল গোস্বামী "স্বপ্নবিলাস" ও "রাই উন্মাদিনী" নাম দিয়া দুই পালা কৃষ্ণলীলা যাত্রা প্রস্তুত করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। এই সকল গাহানের রচনালালিত্যে সে সময়ের শিক্ষিত সম্প্রদায় খুব মুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রাচীন গোবিন্দ কীর্ত্তনিয়া যখন ভাবে বিগলিত হইয়া নানাবিধ কীর্ত্তনের সুরে ঐ "দিব্যোন্মাদ" গান করিত আর তাহার গণ্ড দ্বয় ভাসাইয়া অশ্রুধারা বহিতে থাকিত তখন শ্রোতাগণও ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেন এবং অনেকেই রুমাল দ্বারা বারম্বার অশ্রুজল মুছিতে বাধ্য হইতেন। কোন শনি, রবিবার ফাঁক যাইত না কেন না কোন বাসায় গাহান থাকিতই, এবং প্রতি পালায় ৬০।৭০ হইতে শতাধিক পর্য্যন্ত টাকা আমদানী হইত।

বর্ষাকালে শারদীয়া পূজার অব্যবহিতপূর্ব্বে শ্রীহট্ট জেলা হইতে ভট্টগণ নৌকা লইয়া দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং বাসায় বাসায় যাইয়া সুন্দর সুললিত কবিতা গাইয়া শুনাইত। আহা কি মনোহারিণী কবিতা! কি চমৎকার রাগিণী! এক এক দলে দুই তিন কি চারিজন ভাট এক সঙ্গে সুর মিলাইয়া মুখস্থ কবিতা সকল গান করিয়া যায়, কোন প্রকার বাদ্য যন্ত্রের সহিত তান লয় করিতে হয় না, শুনিতে বড়ই মধুর। পূজার ছুটি নিকটে আসিয়াছে সকলেই বিদেশ হইতে বাড়ী যাওয়ার জন্য ব্যস্ত; পূজার বাজারে ছুটা ছুটী করিতেছে, সেই ব্যস্ততার মধ্যে সড়ক দিয়া হাঁটিয়া যাইতে দুই ধারের বাসা হইতে সেই চিত্তোন্মাদক সঙ্গীতধ্বনি যখন আসিয়া কর্ণে প্রবেশ করিত তখন যে কি পুলকে প্রাণ পূর্ণ হইত, কি আনন্দে হৃদয় উছলিয়া উঠিত, তাহা এখন কাহাকেও বলিয়া বুঝান কঠিন। ভট্ট নরনারায়ণ ও রামমোহন প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের রচিত অনেক সুললিত কবিতা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। কোথাও "ব্রজবুলী" কোথাও হিন্দি কোথাও বাঙ্গলা এবং কখনও বাঙ্গলার সহিত হিন্দি বা ব্রজবুলী মিশান ভাষায় রচিত কবিতা শ্রীহট্টের অধিবাসী ভট্ট-গণের মুখে সেই শ্রীহট্টী সুরে উচ্চারিত ও গীত হইয়া যে এক অতি শ্রুতিসুখকর পদার্থ হইয়া পড়ে, তাহা যাহারা কখনও ইহার স্বাদ গ্রহণ করে নাই বা করিতে সক্ষম হয় নাই তাহারা সম্যক্ বুঝিতে পারিবে না। উমার আগমনী, হরগৌরীর কোন্দল, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, গোপাঙ্গনাগণের জলকেলি ও বস্ত্রহরণ, শিবের বিবাহ, দক্ষযজ্ঞ নাশ, রামচন্দ্রের ধনুর্ভঙ্গ, ইত্যাদি পৌরাণিক কবিতাগুলি অতি উৎকৃষ্ট; আবার ঐতিহাসিক অনেক কবিতা আছে, যথা—কীর্ত্তিনাশা নদীর গতি ও পূর্ব্ববঙ্গের কীর্ত্তিনাশ, কৃত্তিপাশার রাজা রাজকুমারের বিষপ্রয়োগ ও রাজুয়া ভাণ্ডারীর কবিতা, নোওয়াখালীর জলপ্লাবন, এবং ইদানিন্তন কালের কংগ্রেস, ময়মনসিংহের

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ও দেশব্যাপী ভূমিকম্প প্রভৃতি। এই সকল কবিতা যদি মুদ্রিত থাকিত আর এখন খরিদ করিতে পাওয়া যাইত তাহা হইলে কত আগ্রহসহকারে তাহা কত লোকেই ক্রয় করিত! বড় দুঃখের বিষয় এই জিনিষটা একেবারে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। ভট্টগণ আর এ বিষয়ের উন্নতির চেষ্টা বা অনুশীলন করে না। তাহাদের সন্তানেরা যাহাতে বি-এ, বি-এল্ পাশ করিতে পারে তাহারই চেষ্টা করে।